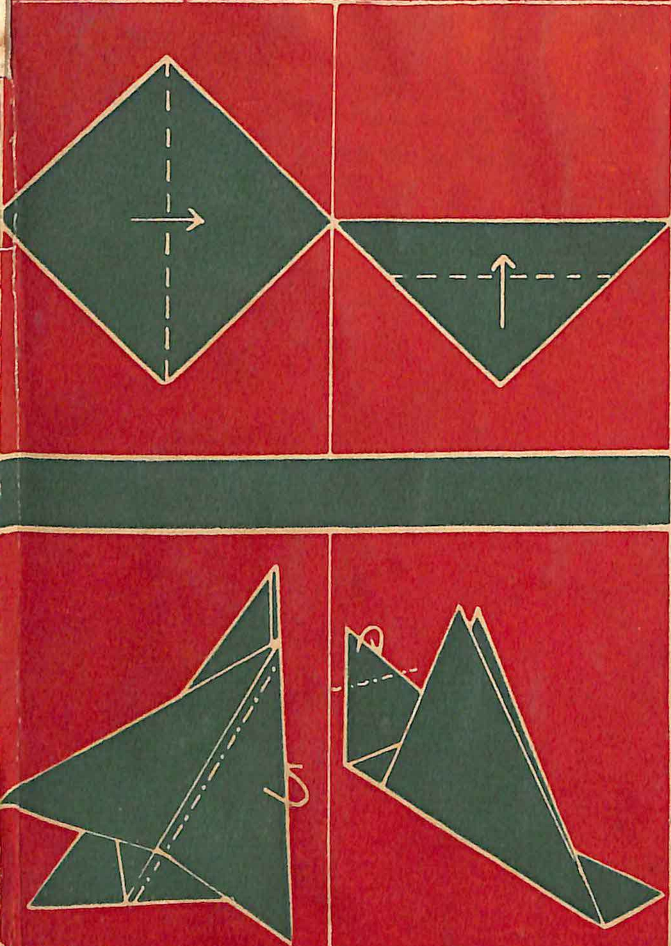
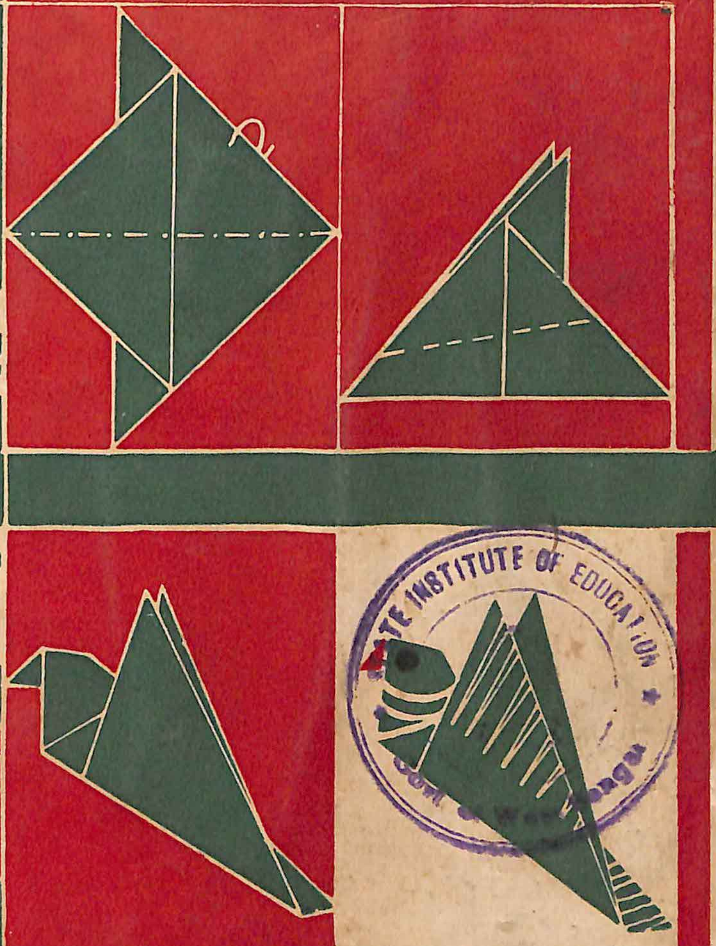


ভাঁজ করার আনন্দে



যাদুকর সমীরণ

ভাঁজ করি আনন্দে

ভাঁজ করি আনন্দে

যাদুকর সমীরণ

৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৮৪

প্রকাশক শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক রবীন্দ্রনাথ দাশ
মুদ্রাকর প্রেস
১০/১সি মারহাট্টা ডিচ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ অজয় গুপ্ত

মূল্য আট টাকা

ভূমিকা

বইটা যাদের জন্য লেখা, ভূমিকাটা তাদের জন্য নয়। বইটা যাঁরা ছোটদের হাতে তুলে দেবেন—ভূমিকাটা তাঁদের জন্যই। 'ওরিগামি' ব্যাপারটা কেবল ছেলেমানুষী খেলাই নয়। শিল্প হিসেবেও এটা এখন বিশ্ববন্দিত। জাপানে এটা তাদের সংস্কৃতিরও একটা অঙ্গ। জাপানের ইতিহাসের 'মুরোমাচি পর্বে' (১৩৩৬-১৫৬৮) ওরিগামি তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কবি শেলী, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, দার্শনিক মিগুয়েল দে উনামুনো ইত্যাদির মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরাও ওরিগামিতে উৎসাহী ছিলেন। জাপান তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ওরিগামিস্ট আকিরা ইওসিজাওআ কেবল ওরিগামির জন্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন। সুতরাং, শিল্প হিসাবে ওরিগামির গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

ওরিগামি ছোটদের শিল্পচেতনাকে বাড়াতে সাহায্য করে। হাতের কাজ আজকাল শিশুশিক্ষার একটা অঙ্গ। পড়াশুনার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মধ্যে যেন সৌন্দর্যবোধও সৃষ্টি হয়, সেজন্য একই সঙ্গে ছবি আঁকা, মডেল তৈরী করা ইত্যাদি ব্যাপার-গুলোতেও ছোটদের উৎসাহী করে তোলা হচ্ছে। সেদিক থেকেও, খেলার ছলে হাতের কাজ শিখতে, এই বইটা তাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

এই বইটা খুব ছোটদের জন্য লেখা,—ওরিগামির ব্যাপারে আমার জ্ঞান কতখানি তা' প্রকাশের জন্য নয়। সুতরাং,

ছোটরা সহজেই করতে পারে এমন কতকগুলি মডেলই এতে শেখানো হয়েছে। জটিল কোনো মডেলের ধারেকাছেও আমি যাইনি। যদি ছোটদের এই বইটা ভালো লাগে, এবং যদি তারা সত্যিই আরও উঁচু ধাঁচের মডেল শিখতে আগ্রহী হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও একটু উচ্চতর মডেল শেখানোর বই লেখার ইচ্ছা রইলো। খুব ছোটদের জন্য লেখা বলেই শুদ্ধ ওরিগামি, মিশ্র ওরিগামি কাগজ-ভাস্কর্য ইত্যাদি পার্থক্য নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি। চোখে যেটাকে সুন্দর লাগে সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

যাঁদের সাহায্য ছাড়া এই বইটি লেখা মোটেই সম্ভব হতো না তাঁরা হলেন, সাংবাদিক ও কবি শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় এবং "ইণ্ডিয়ান ওরিগামিস্ট" এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশৈলন মুখোপাধ্যায়। এই বইটি লেখার ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এঁরা কতখানি সাহায্য করেছেন তা' লিখে বোঝানো শক্ত। 'আশা প্রকাশনী'র শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য এই বইটি লেখার জন্য যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। তাঁর উৎসাহ না থাকলে এটা কোনো দিনই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতো না। এঁদের সকলের কথাই আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমার ধারণা, ওরিগামি নিয়ে লেখা এটাই প্রথম বাংলা বই। যাদের জন্য এটা লেখা, সেই ছোটদের মধ্যে একজনও যদি এটা পড়ে সত্যিই কিছু শিখতে পারে এবং ওরিগামিতে উৎসাহী হয়ে ওঠে, তাহলেই আমার লেখা সার্থক হয়ে উঠবে।

যাদুকর সমীরণ

সূচীপত্র

কা'কে বলে ওরিগামি ১
ওরিগামির চিহ্ন ৫
চৌকো সমস্যা ১৭
হাবুদের কুকুর ২০
বেড়াল ২২
চরকী পাখা ২৫
গাছ ২৮
তাঁবু ৩১
প্রজাপতি ৩৬
বাড়ি ৩৯
খেলাঘরের চেয়ার ৪২
দাঁত খিঁচোনো খ্যাকশেয়ালি ৪৪
রাজহাঁস ৪৯
জেট প্লেন ৫৩
মাছ ৫৮
পদিপিসীর বর্মিবাক্স ৬৪
জোড়া নৌকো ৬৮
আয়রে আয় টিয়ে ৭৩
এক রতি ইঁদুরছানা
মাছি করে ভন্ ভন্ ৮২
সামুরাই টুপি ৮৫
নন্দ ঘোষের গরু ৯০
জাপানী লণ্ঠন ৯৫
ওরিগামি লাগে কিসে ৯৯

কা'কে বলে 'ওরিগামি'

এসো আমরা 'ওরিগামি' করি।

কথাটা তোমরা ঠিক বুঝলে না তো? নিশ্চয়ই ভাবছো 'ওরিগামি'—সেটা আবার কী? যেমন শক্ত আর বিচ্ছিরি নাম—তেমনি শক্ত ধরনেরই কিছু একটা হবে বোধ হয়। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই শক্ত একটা কিছু নয়। আরও অবাক-করা কথা কী জানো? তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অনেকবার করে ওরিগামি করেছো। এবার নিশ্চয়ই হাঁ করে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলে, যার নামই কোনদিন শোনোনি—সেটা আবার করে দেখলে কবে? আচ্ছা, আর একটু খুলেই বলি তোমাদের।

তোমরা কোনদিন কাগজ ভাঁজ করে নৌকো বানাও নি? কিংবা জাহাজ—অথবা দোয়াত? বানিয়েছো তো?—আর সেটাই তো হল 'ওরিগামি'। আসল ব্যাপারটা কি জানো? 'ওরিগামি' জাপানী শব্দ। এর মানে হল কাগজ ভাঁজ করা। তাই কথাটা কানে একটু খটমট ঠেকলেও, আসলে ওরিগামি করা মানে—কাগজ ভাঁজ করে নৌকো জাহাজ কিংবা দোয়াতের মতো কিছু তৈরী করা। এবারে ব্যাপারটা তোমাদের কাছে জলের মত সহজ হয়ে গেলেও, অনেকে কিন্তু এখনও মুখ ভার করে বসে আছো। তারা ভাবছো, সাদা বাংলায়—এসো আমরা কাগজ ভাঁজ করি, না বলে হঠাৎ একটা শক্ত জাপানী কথা জুটিয়ে, এসো আমরা ওরিগামি করি বললাম কেন? আর যদি অন্য ভাষাতেই বলতে হয় তাহলে—ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান বা হিব্রুতে না বলে জাপানী ভাষাই বা কেন? এটাও তাহলে একটু বুঝিয়ে বলি। এইযে কাগজ ভাঁজ করে নানারকম জিনিস তৈরী করার মজার খেলা, এটা সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল

জাপান থেকেই। আর সেইজন্যই পৃথিবীর সব দেশই কাগজ ভাঁজ করার মজার খেলাটাকে তার জাপানী নাম ওরিগামি বলেই ডাকে। এবার নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো কেন আমি ওরিগামি বলেছি। আর আমি এও জানি তোমরা এখন আর ওরিগামি কথাটাকে মোটেই বিচ্ছিরি ভাবছো না ; বরঞ্চ তোমাদের মনে হচ্ছে, ওরিগামিটা কী মিষ্টি নাম। কারণ, তোমরা সবাই জেনে গেছো, আসলে এটা হল কাগজ ভাঁজ করে কিছু জিনিস তৈরী করার মজার খেলা।

তোমরা হয়তো ভাবতে পারো কাগজ ভাঁজ করে এই যে কিছু বানানোর মজার খেলা, সেই খেলাটা কেবল তোমাদের মতো ছোটরাই খেলে থাকে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। পৃথিবীর নানা দেশের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকেরাও এই খেলাটা খেলেন এবং মাথা ঘামিয়ে নানারকম নতুন-নতুন জিনিস বানানোর চেষ্টা করেন। ভালো ছবি আঁকিয়ে বা গাইয়ে বা বাজিয়েদের যেমন আমরা 'শিল্পী' বলে সম্মান করি, ঠিক তেমনি ভালো 'ওরিগামিস্ট' অর্থাৎ কাগজ ভাঁজিয়েদেরও পৃথিবীর লোক শিল্পী বলে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন। কেবল কাগজ ভাঁজিয়ে হিসাবেই এঁদের পৃথিবীজোড়া নাম।

জাপানের এমনি একজন গুণী কাগজ ভাঁজিয়ের নাম হল, আকিরা ইওসিজাওআ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাগজ ভাঁজিয়ে হিসাবেও এঁর নামই করতে হয়। ইনি যে কাগজ ভাঁজ করে কত সুন্দর সুন্দর আর মজার মজার জিনিস বানিয়েছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। আকিরার সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শোনো। একবার কয়েকজন এঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন্ জিনিসটা বানাতে আপনার সরচেয়ে বেশী সময় লেগেছে? উত্তরে আকিরা বলেছিলেন, একটা ঝিঁ ঝি পোকা বানাতে ওঁর সরচেয়ে বেশী সময় লেগেছে! আর সেই সময়টা হল—তেইশ বছর। তোমরা ভাবতে পারো যে কাগজ ভাঁজ করে একটা ঝিঁ ঝি পোকা

বানাতে তেইশ-তেইশটা বছর সময় লাগতে পারে? শুধু তাই নয়, এটা বানাতে গিয়ে আকিরাকে ঝিঁঝি পোকার শরীর কেমন-তা' নিয়ে রীতিমত পড়াশুনাও করতে হয়েছিল। তার ফলে যে পোকাটির সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কারো হাতে দিলে, সে সেটাকে সত্যিকারের পোকা মনে করে চমকে উঠতো।
আকিরাকে যখন প্রশ্ন করা হল, এমন একটা অদ্ভুত জিনিস আপনি কেমন ভাবে তৈরী করলেন? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ওটা কি আর আমি করেছি, ভগবান এসে আমার হাত দিয়ে ওটা তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। আকিরা ইওসিজাওআ সম্বন্ধে আর একটা অদ্ভুত খবর হল, ইনি কাগজ ভাঁজ করে নিজের মুখের চেহারাটা তৈরী করেছিলেন এবং একদম অবিকল চেহারা। বুঝতেই পারছো কতবড় কাগজ ভাঁজিয়ে তিনি।
এ ছাড়াও আরও অনেক জাপানী কাগজ ভাঁজিয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, কুনিহিকো কাসাহারা, ডকুহটি নাকানো, ওকিমাসা য়ুচিআমা ইত্যাদি। অন্য দেশের কাগজ ভাঁজিয়েদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যাঁর নাম মনে আসে তিনি হলেন লণ্ডনের রবার্ট হারবিন্। ইনি ওরিগামি নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করেছেন এবং অনেক কটা বইও লিখেছেন। রবার্ট হারবিন্ বেশী বিখ্যাত তাঁর সুন্দর সুন্দর বইগুলোর জন্যই।
কাগজ দিয়ে জিনিস তৈরীর ব্যাপারটাকে আমরা মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা বা একের বেশী কাগজকে কেবল ভাঁজ করে করে আমরা কোনো জিনিস বানাতে পারি। একে বলে ওরিগামি। আর কাগজ কেটে, আঠা দিয়ে জুড়ে, রং করে কিংবা কাগজের মণ্ড দিয়েও নানা রকম জিনিস তৈরী করা যায়। এটা কিন্তু পুরোপুরি ওরিগামি নয়। গালভরা শক্ত ভাষায় বললে, এটাকে বলা যায়—'কাগজ-ভাস্কর্য'। ওরিগামিতে আঠা দিয়ে জোড়া, কাঁচি দিয়ে কাটা, রং করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিষেধ। তোমরা কিন্তু এই বইতে কাগজ

ভাঁজ করে যা যা করতে শিখবে, তার অনেক কটাতেই কাঁচি দিয়ে কাটতে বা রং করতে বলা হয়েছে। কারণটা কি জানো? যে কোনো ব্যাপারেই আমরা সুন্দর জিনিসটা পছন্দ করি। ওরিগামির বেলাতেও তাই। সেজন্যই অতো কড়াকড়ি নিয়ম-কানুনের মধ্যে না গিয়ে, দেখতে সুন্দর দেখানোর জন্য যা যা করলে ভালো হয়, আমরা তা করবো। তোমরাও নিশ্চয়ই তাই-ই চাও।

ওরিগামির ব্যাপারে অনেক কিছু জানলে। এবারে কাগজ ভাঁজ করে সত্যিসত্যিই নানারকম জিনিস বানাতে হবে। যাকে 'হাতে-কলমে' করা বলা হয় আর কি। কবিতার সেই লাইনটা মনে আছে তো? "জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার।" ঠিক তেমনই বই পড়ে মনে মনে ওরিগামিটা শিখে নিয়ে তারপর কাগজ ভাঁজ করে কিছু বানিয়ে ফেলাটা খুব শক্ত ব্যাপার। বই পড়ার সময়েই এক টুকরো কাগজ নিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাঁজ করে যেতে হবে। তাহলেই দেখবে একদম শক্ত মনে হচ্ছে না। কাগজ ভাঁজ করে চটপট বানিয়ে ফেলতে পারছো কুকুর, বেড়াল, টুপি কিংবা বাক্স। কেবল ছবিগুলো দেখলে হয়তো মনে হতে পারে যে, ওগুলো খুবই জটিল। আসলে কিন্তু মোটেই তা' নয়। তোমাদের মত ছোটরা যাতে খুব সহজে বানাতে পারো, তেমন জিনিসই এতে শেখানো আছে। একটু ধৈর্য ধরে করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

কাগজ নিয়ে ভাঁজ করে বানাও। তারপর রং দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখো। দেখবে কত আনন্দ হবে তোমাদের। আর সেই সব জিনিসগুলো দেখে, বড়রাও আনন্দ পাবেন— সেই সঙ্গে অবাকও হবেন এই কথা ভেবে যে, কেমন ভাবে ওই সব মজার মজার কাগজের জিনিসগুলো তোমরা বানালে।

এবারে এসো তাহলে আমরা সবাই 'ভাঁজ করি আনন্দে।'

ওরিগামির চিহ্ন

ওরিগামি অর্থাৎ কাগজ ভাঁজ করার খেলাটা খেলতে গেলে কতকগুলো চিহ্ন জেনে রাখতে হয়। এই চিহ্নগুলো দেখলে পরেই ওরিগামিস্ট অর্থাৎ কাগজ ভাঁজিয়েরা বুঝতে পারেন যে একটুকরো কাগজকে কেমন ভাবে ভাঁজ করতে হবে। এতে কাগজ ভাঁজের ব্যাপারটা বোঝার বা বোঝানোর জন্য অনেক অনেক কথা খরচা করতে হয় না। এমন কি লেখা না পড়ে কেবল ছবি দেখেই বুঝতে পারা যায় কাগজটা কেমন ভাবে ভাঁজ হবে। তোমরাও তো এবার কাগজ ভাঁজিয়ে হতে যাচ্ছো, তাই তোমরাও চিহ্নগুলো খুব ভালো ভাবে চিনে নাও --যাতে সহজেই বুঝতে পারো কী করতে হবে আর কেমন ভাবে করতে হবে।

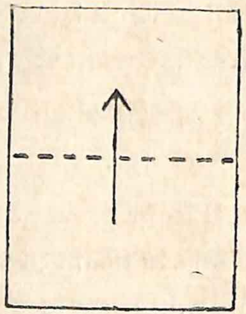
জাপানের বিখ্যাত কাগজ ভাঁজিয়ে আকিরা ইওসিজাওআর নাম তোমাদের আগেই বলেছি। তিনি যে-সব চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন, সেই সব চিহ্নগুলোকেই পৃথিবীর তাবৎ কাগজ ভাঁজিয়েরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তোমরাও এখানে তাঁর ব্যবহৃত চিহ্নগুলোই শিখবে।

আর একটা কথা, ওরিগামিতে বহু রকমের চিহ্ন আছে। এই বইতে যেসব জিনিস শেখানো হয়েছে, সেগুলো বানাতে গেলে যে চিহ্নগুলো জানার দরকার হবে, কেবল সেগুলোই তোমাদের জানিয়েছি—বাকীগুলো নয়। আর একটু বড় হয়ে, যখন তোমরা কাগজ ভাঁজ করে আরও শক্ত ধরনের জিনিস বানাতে চাইবে, তখনই ওই সব চিহ্নের দরকার হবে। ওগুলো তখন শিখলেই চলবে।

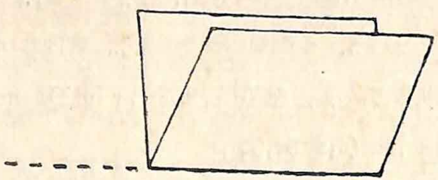
এবার এসো চিহ্নগুলো জানা যাক।



পাশে যে ছোট ছোট ড্যাসের লাইনটা দেখছো, সেটা হলো নীচু ভাঁজের চিহ্ন।



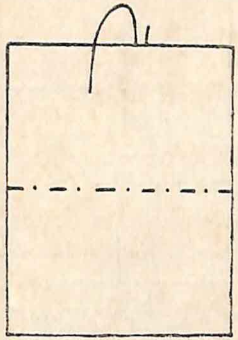
একটা কাগজে এই চিহ্ন থাকলে, কাগজটাকে সেখানে নীচু ভাঁজ দিতে হবে।



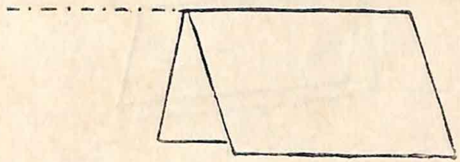
নীচু ভাঁজ হওয়ার পর কাগজটা ইংরাজী 'ভি' (V) অক্ষরের মতন দেখায়।

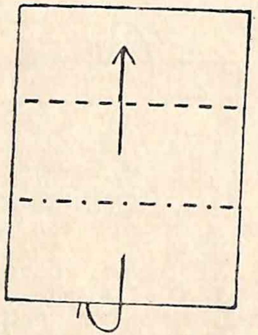
ড্যাস আর ফুলস্টপ দিয়ে তৈরী চিহ্নটা উঁচু ভাঁজের চিহ্ন।

যেখানে উঁচু ভাঁজের চিহ্ন থাকবে, সেই লাইন বরাবর উঁচু ভাঁজ করতে হবে।

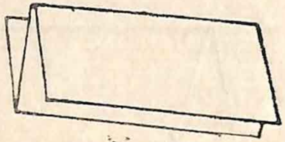


কাগজে উঁচু ভাঁজ হওয়ার পর সেটা উল্টো 'ভি' (Λ) এর মতো দেখাবে।

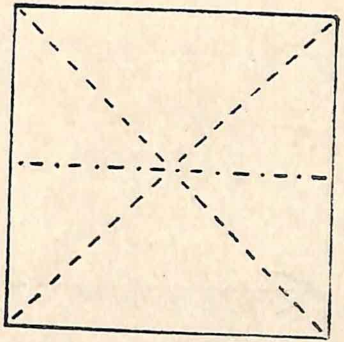


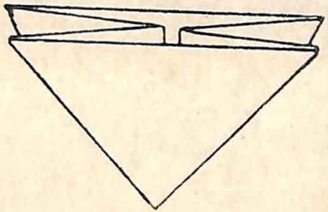


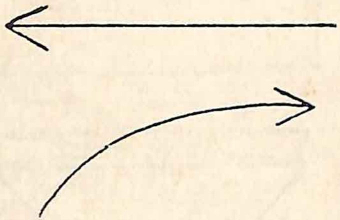
নীচু ভাঁজ আর উঁচু ভাঁজটা বুঝলে তো ? পাশের কাগজটাতে উঁচু আর নীচু দু'টো ভাঁজই দেওয়া আছে। সুতরাং, সেটা ভাঁজ হলে ঠিক তার নীচের ছবিটার মতই হবে।



পাশের চৌকোণা কাগজটাতেও উঁচু আর নীচু দু'টো ভাঁজই দেওয়া আছে। তোমরা এক টুকরো কাগজ নিয়ে ছবি অনুযায়ী উঁচু নীচু ভাঁজ দাও। যদি ঠিক মতো করতে পারো তাহলে সেটা ঠিক এর নীচের ছবিটার মতই দাঁড়াবে।



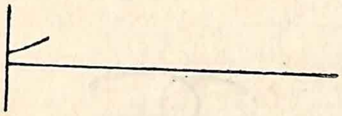


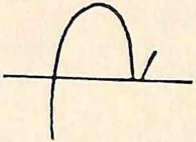


ওরিগামি করতে গেলে নীচু ভাঁজ আর উঁচু ভাঁজ, দু'টোই খুব দরকারী। তোমরা যাতে এ-দুটো ভালো ভাবে বুঝতে পারো সে জন্যই ওপরের উদাহরণ দু'টো দেওয়া। ভালো ভাবে বোঝার জন্য এক টুকরো কাগজ নিয়ে হাতে নাতে করে দেখো।

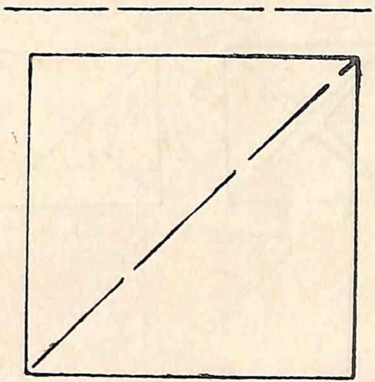
তীর চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়, কাগজটা কোন্ দিকে ভাঁজ হবে বা টানতে হবে। নীচু ভাঁজের ছবিটা দেখো। তীরটা ওপর মুখো। অর্থাৎ কাগজটায় নীচু ভাঁজ দিয়ে ওপরে তুলতে হবে।

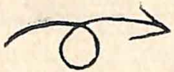
আধখানা তীরের মানে হলো কাগজটা পেছন দিকে ভাঁজ করা। উঁচু ভাঁজের ছবিটা দেখো। এতে আধখানা তীরের ছবি আছে। তার মানে কাগজের ঐ অংশটা পেছন দিকে ভাঁজ করে উঁচু ভাঁজটা করতে হবে।



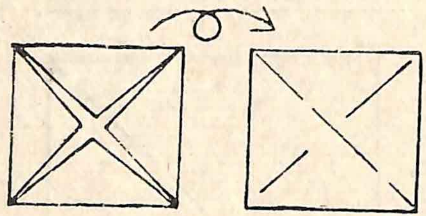


লম্বা লম্বা লাইনের মানে হলো ভাঁজের দাগ। মনে করো, একটা চৌকো কাগজকে কোণাকুণি ভাঁজ করে আবার খুলে ফেলা হলো। তাহলে এতে কোণাকুণি ভাঁজের দাগ থাকবে। পাশের ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে।





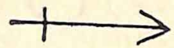
যদি কোনো ভাঁজ করা কাগজকে উল্টোতে অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে পাশের ছবির মতন একটা পাক খাওয়ানো তীরের ছবি ব্যবহার করতে হয়।

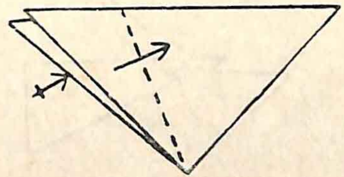


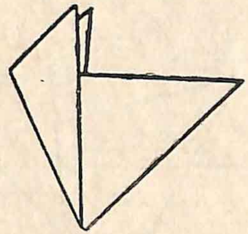
ছবিতে দেখো একটা চৌকো কাগজ ভাঁজ করা হয়েছে। এর পাশে ঐ পাকানো তীরের চিহ্ন। তার পাশে ওই ভাঁজ করা কাগজের উল্টো পিঠটা। তার মানে কাগজটা উল্টে ধরা হয়েছে।

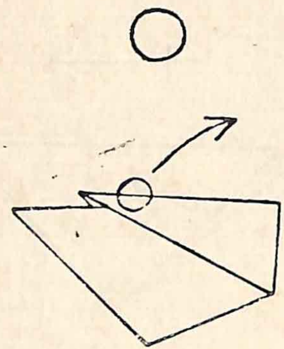
এই রকম চিহ্ন দেখলেই তোমরা কাগজটা উল্টে নেবে। অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে নিয়ে আসবে।

দাগ কাটা তীরটার মানে হলো, সামনের কাগজে যে ভাঁজটা করা হয়েছে পেছনের কাগজেও সেই ভাঁজটাই করো। পাশের ছবিতে দেখো, তিন-কোণা কাগজটার সামনের স্তরে একটা নীচু ভাঁজের চিহ্ন। পেছনের স্তরে কাটা-তীর চিহ্ন। অর্থাৎ পেছনের স্তরটাতেও সামনের মতনই ভাঁজ করতে হবে। ভাঁজ হওয়ার পর ব্যাপারটা কেমন হবে দেখো।



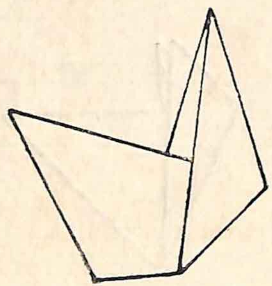




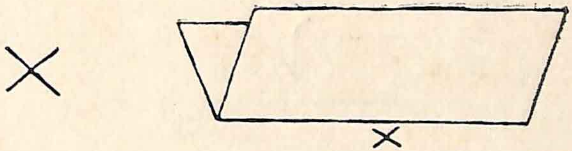


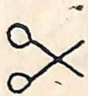
কাগজের যে জায়গায় গোল চিহ্ন থাকবে, সেখানটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে।

পাশের ছবিতে দেখো, গোল চিহ্ন দিয়ে, তীর দেওয়া হয়েছে। তার মানে, গোল চিহ্নের জায়গাটা চেপে ধরে, যে দিকে তীর রয়েছে সে দিকে টানো। তাহলেই সেটা দেখতে ঠিক তার নীচের ছবিটার মতন হবে।

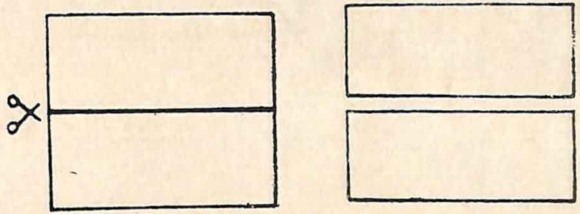


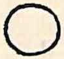
যদি ভাঁজ করা কাগজের কোন একটা বিশেষ জায়গা লক্ষ্য করতে বলা হয়, তাহলে সেখানে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়। অর্থাৎ ক্রস চিহ্নের মানে হলো—জায়গাটা লক্ষ্য করো, 'একটা কিছু' করতে হবে।





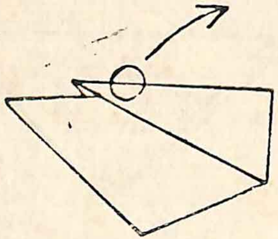
পাশের ছবির মতো কাঁচি চিহ্ন যেখানে থাকবে, সেখানটা কাটতে হবে। চৌকো কাগজের মাঝখানের লাইনটার পাশে কাঁচি চিহ্ন রয়েছে। তার মানে, ওই লাইন বরাবর কাগজ-টাকে কেটে ফেলতে হবে। কাগজে কাঁচি চিহ্নের পাশে যতটা লাইন আঁকা থাকবে ততটাই কাটতে হবে।

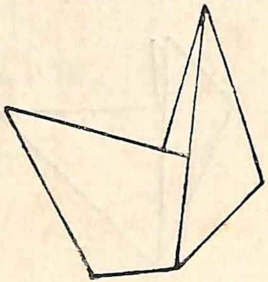




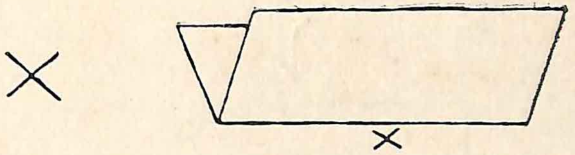
কাগজের যে জায়গায় গোল চিহ্ন থাকবে, সেখানটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে।

পাশের ছবিতে দেখো, গোল চিহ্ন দিয়ে, তীর দেওয়া হয়েছে। তার মানে, গোল চিহ্নের জায়গাটা চেপে ধরে, যে দিকে তীর রয়েছে সে দিকে টানো। তাহলেই সেটা দেখতে ঠিক তার নীচের ছবিটার মতন হবে।

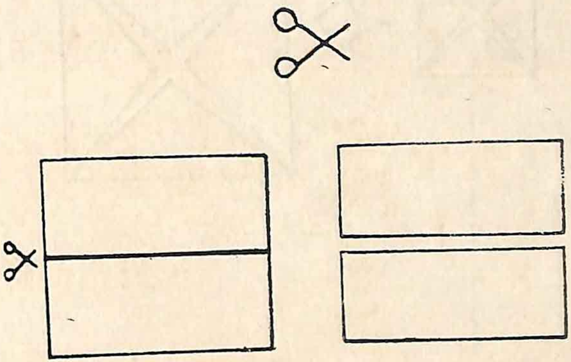




যদি ভাঁজ করা কাগজের কোন একটা বিশেষ জায়গা লক্ষ্য করতে বলা হয়, তাহলে সেখানে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়। অর্থাৎ ক্রস চিহ্নের মানে হলো—জায়গাটা লক্ষ্য করো, 'একটা কিছু' করতে হবে।

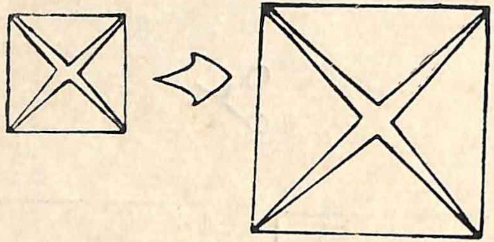


পাশের ছবির মতো কাঁচি চিহ্ন যেখানে থাকবে, সেখানটা কাটতে হবে। চৌকো কাগজের মাঝখানের লাইনটার পাশে কাঁচি চিহ্ন রয়েছে। তার মানে, ওই লাইন বরাবর কাগজ-টাকে কেটে ফেলতে হবে। কাগজে কাঁচি চিহ্নের পাশে যতটা লাইন আঁকা থাকবে ততটাই কাটতে হবে।





যখন কোনো ছবিকে বড় করে এঁকে দেখানো হয়, তখন পাশের ছবির মতো বিশেষ ধরনের তীর চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।



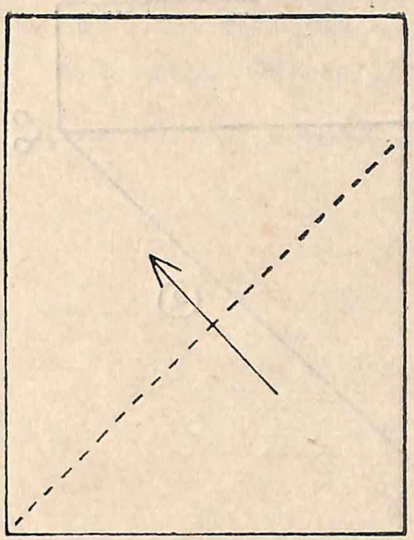
একটা চৌকো কাগজকে ভাঁজ করা হয়েছে। এই ছবিটা একটু বড় করে এঁকে ভালভাবে বোঝানো দরকার। তাই ঐ বিশেষ তীর চিহ্নটি এঁকে তার পাশে ভাঁজ করা কাগজের ছবিটাই বড় করে আঁকা হবে। কোনো দু'টো ছবির মাঝখানে এই চিহ্নটা থাকার মানে, আগের ছবিটাই বড় করে পরেরটাতে আঁকা হয়েছে।

চিহ্নগুলো শেখা হল। এবার আমরা সত্যি সত্যিই কাগজ ভাঁজ করে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করার কাজে নামবো।

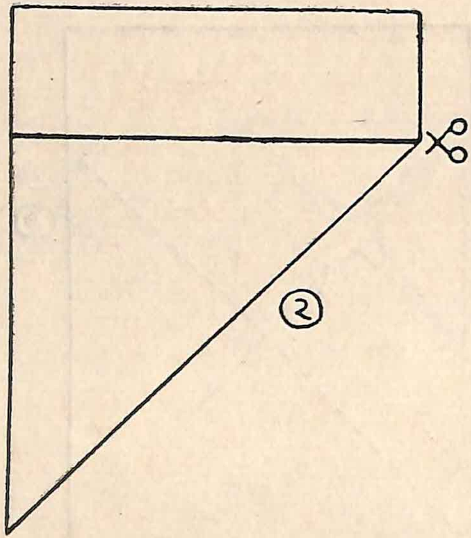
চৌকো সমস্যা

এই বইতে তোমরা যে জিনিসগুলো তৈরী করতে শিখবে, তার মধ্যে কেবল বাক্সটা বাদে আর সবগুলোই তৈরী করতে হয় এক টুকরো চৌকো কাগজ থেকে। চৌকো কাগজ বলতে আমি বোঝাচ্ছি, যে কাগজটা লম্বা এবং চওড়ায় সমান। এবং যার চারটে কোণের প্রত্যেকটাই ৯০ ডিগ্রী করে। সমান লম্বা-চওড়া কাগজ তোমরা হয়তো এমনিতে পাবে না, এটা তোমাদের ঠিক মতো কেটে তৈরী করে নিতে হবে। কেমন ভাবে ঠিক চৌকো কাগজ পাবে তা নিয়ে তোমরা হয়তো সমস্যায় পড়তে পারো, কিন্তু আসলে এটা করা খুবই সহজ।

মনে করো, তোমরা যে কাগজটা পেলে সেটা ১নং ছবির মতো লম্বা আর চওড়ায় সমান নয়। এই কাগজটাতে ১নং ছবির

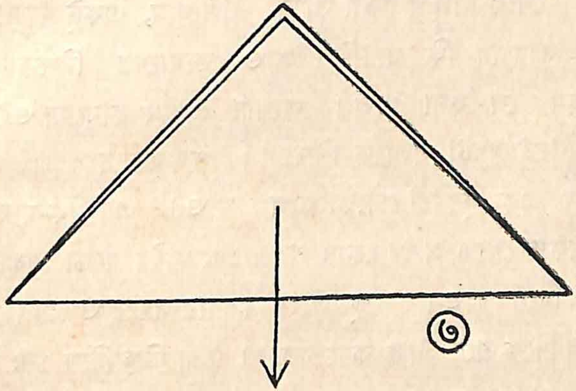


১



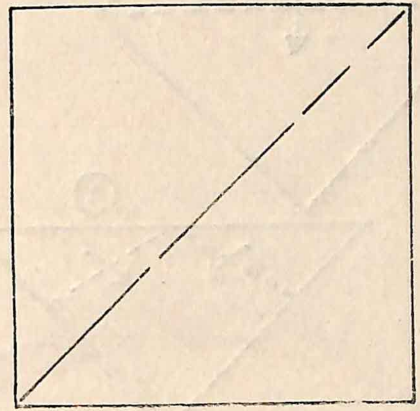
মতো কোণাকুনি ভাঁজ দিয়ে চওড়া দিকটা পাশের লম্বা দিকের সঙ্গে মিশিয়ে ধরো-ঠিক ২নং ছবির মতো করে। তাহলে ভাঁজ করা কাগজের নীচের অংশটা একটা ত্রিভুজের মতো হলো আর ওপরে খানিকটা বাড়তি অংশ থেকে গেল। এই বাড়তি অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দাও। কোন্ জায়গাটা কাটা হচ্ছে তা তোমরা ২নং ছবির কাঁচি চিহ্নটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

কাটা হয়ে যাওয়ার পর কেবল ৩নং ছবির মতো ত্রিভুজটাই রয়ে গেল। এবার কোণাকুনি ভাঁজটা খুলে ফেলো। ব্যাস্, ৪নং ছবির মতো ঠিক চৌকো, অর্থাৎ লম্বায়-চওড়ায় সমান কাগজের টুকরো তুমি পেয়ে গেলে।

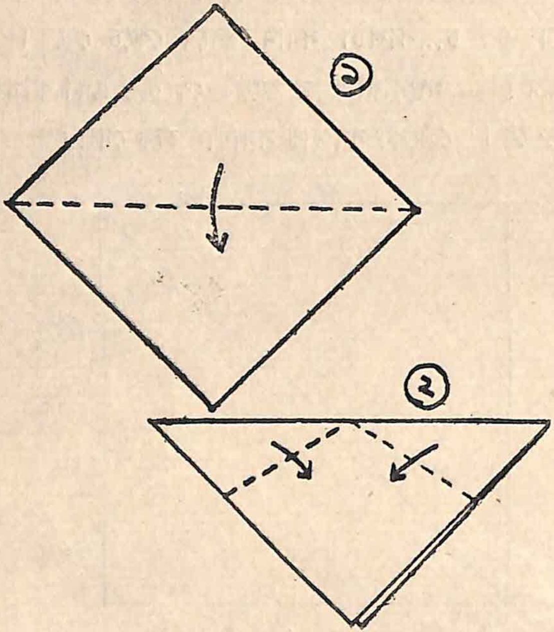


৩

যদি আঁকা-বাঁকা করে কাটা কাগজের টুকরো পাও তাহলে প্রথমে এর চারপাশটা সমান ভাবে কেটে নেবে। তারপর ওপরের নিয়ম অনুযায়ী ভাঁজ করে—কেটে চৌকো কাগজ তৈরী করে নেবে। চৌকো-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।



৪



হাবুদের কুকুর

নজরুলের সেই কবিতাটা তোমাদের সকলেরই জানা নিশ্চয়ই,

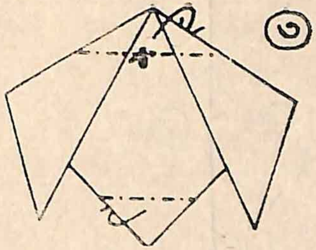
"বাবুদের তাল পুকুরে হাবুদের ডাল কুকুরে
সেকি বাস্ ক'রলো তাড়া বলি থাম, একটু দাঁড়া !"

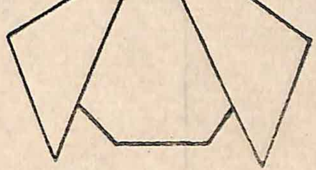
আর তারপর কি ঘটেছিল তাও তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সে কথা থাক। আমরা প্রথমে হাবুবের ওই ডাল-কুকুরটারই মুখটা বানাতে শিখবো। খুব মজা হবে তাই না ? প্রথমে এক টুকরো চৌকো কাগজ নাও। এর ঠিক মাঝামাঝি এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত ১নং ছবির মতো একটা নীচু ভাঁজ দিয়ে দাও। নীচু ভাঁজ করবার সময়ে ওপরের কোণটা নীচের দিকে এনে ভাঁজ করতে হবে। তীর চিহ্ন দিয়ে ১নং ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে। তাহলে এটা ২নং ছবির মতো হলো।

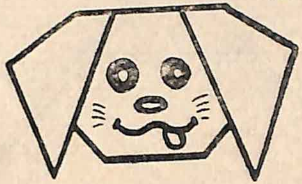
২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ভাবে ছু-পাশে নীচু ভাঁজ করো। এই অংশ ছুটো হবে ডাল-কুকুরের ছুটো কান। আর পুরো ব্যাপারটার চেহারা হবে ৩নং ছবির মতো।

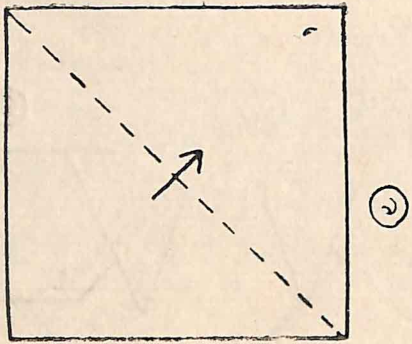
এবারে ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে ওপরে এবং নীচে উঁচু ভাঁজ দিয়ে, ওই অংশ ছুটো পেছন দিকে মুড়ে দাও। আধখানা তীরের মানে যে পেছন দিকে ভাঁজ করে দেওয়া তা' নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে।

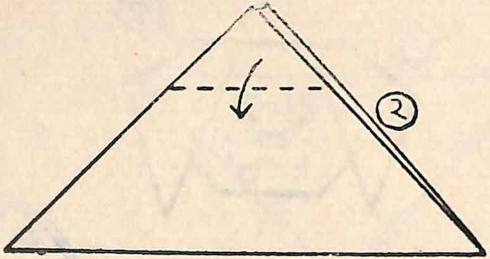
তাহলেই ৪নং ছবির মতো কুকুরের মুখ তৈরী হয়ে গেল। এইবার ৫নং ছবির মতো করে রং দিয়ে চোখ, মুখ, নাক এঁকে দাও। দেখে মনে হচ্ছে না—হাবুদের ডাল-কুকুরটা জিভ বার করে তেড়ে আসছে?


৩


৪


৫





বেড়াল

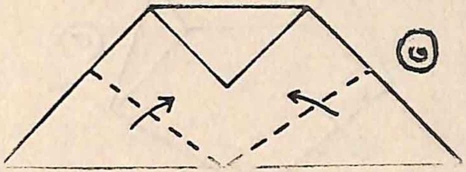
প্রফেসর শঙ্কুর পোষা বেড়াল নিউটনের কথা তোমাদের মনে আছে তো ? সেই যে একবার প্রফেসর শঙ্কু তাঁর ভাষা অনুবাদ করার যন্ত্র লিঙ্গুয়াগ্রাফে নিউটনের তিন রকম ম্যাও ডাক রেকর্ড করে তার তিন রকম মানে পেয়েছিলেন—'দুধ চাই', 'মাছ চাই' আর 'ইঁদুর চাই'। যাতে তাঁর মনে হয়েছিল পোষা বেড়াল নিউটনের খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আর কথাই নেই। এবার সেই নিউটনের মুখটা কাগজ ভাঁজ করে তৈরী করলে কেমন হয় ?

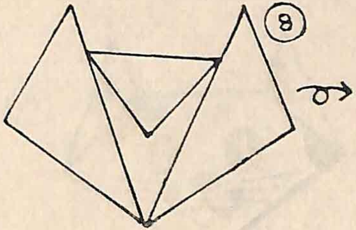
একটা চৌকো কাগজ নিয়ে ১নং ছবি অনুযায়ী মাঝামাঝি জায়গায় নীচু ভাঁজ দিয়ে তলার কোণটাকে ওপর দিকে মুড়ে দাও। ২নং ছবির মতো চেহারা পাওয়া গেল।

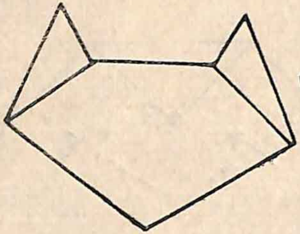
২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ওপর দিকের কোণের কাগজের দু'টি স্তরই নীচু ভাঁজ দিয়ে তলায় নামিয়ে দাও। তাহলে এর চেহারাটা হবে ৩নং ছবির মতো।

৩নং ছবির দু'পাশের দু'টো নীচু ভাঁজের দাগ অনুযায়ী, দু'পাশের কোণ দু'টোকে ওপর দিকে তুলে দাও। এটা এখন ৪নং ছবির মতো দেখাবে।

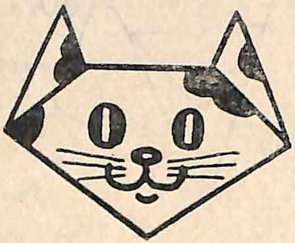
৪নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজটা উল্টে দাও। অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে নিয়ে এসো। ৪নং ছবির পাশে পাক খাওয়ানো তীর চিহ্নটা দেখেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা উল্টে দিতে হবে।







৫



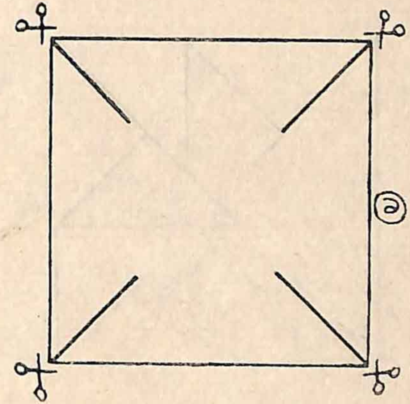
৬

উল্টোনো হলে এর চেহারাটা ৫নং ছবির মতো দেখাবে। এবারে রং দিয়ে ৬নং ছবির মতো নিউটনের চোখ, নাখ, মুখ, গোঁফ ইত্যাদি এঁকে দাও। নিউটন এখন পুরোপুরি তৈরী। দেখ দেখি এবার কি বলছে ও—মাছ চাই, দুধ চাই না ইঁদুর চাই?

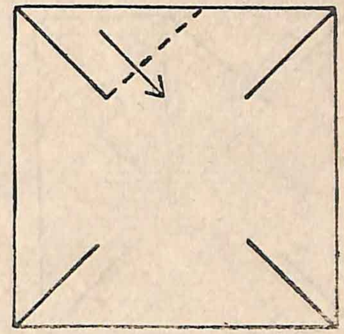
চরকী পাখা

একটা চরকী-পাখা তৈরী করলে কেমন হয় বল তো? হাওয়া লাগলেই যে পাখাটা ঘুরবে—পন্‌-পন্‌, বন্‌-বন্‌, শন্‌-শন্‌। খুব মজা হবে তাই না? কিংবা, চরকী হিসাবে না ভেবে, এটাকে ফুল বলেও ভাবা যায়। রঙীন কাগজ দিয়ে অনেক কটা বানিয়ে পরপর সাজিয়ে দিলে কী সুন্দরই না দেখাবে। একটা রঙীন চৌকো কাগজ দিয়ে এটা তৈরী করতে হবে। আরও ভালো দেখাবে, যদি চৌকো কাগজটার একপিঠ রঙীন আর অন্য পিঠটা সাদা হয়।

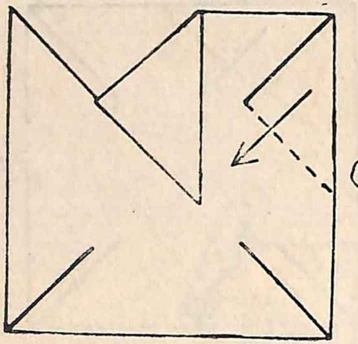
১নং ছবির মতো চৌকো কাগজটার চারটে কোণই খানিকটা ছবির মতো করে কাঁচি দিয়ে কেটে নাও। এবার ২নং ছবির মতো বাঁ দিকের ওপরের কোণটাতে নীচু ভাঁজ দিয়ে দাও।



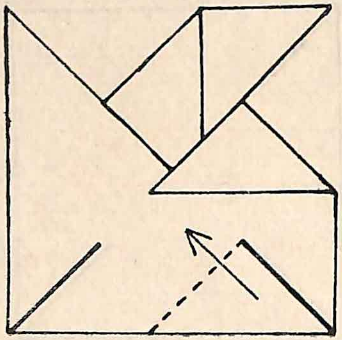
১



২



৩

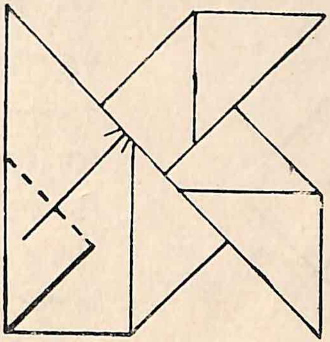


৪

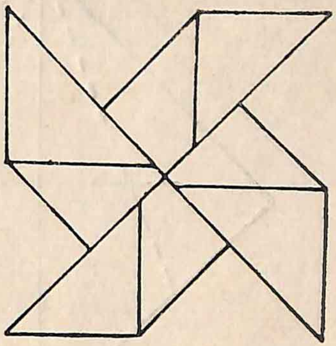
ভাঁজ হওয়ার পর সেটা ৩নং ছবির মতো দেখাবে। এরপর ৩নং ও ৪নং ছবির মতো পরপর ডান দিকের ওপরের কোণটা এবং ডান দিকের নীচের কোণটাতে নীচু ভাঁজ দিয়ে মুড়ে দাও। এই দুটো কোণই ভাঁজ হয়ে যাওয়ার পর এর চেহারাটা হবে ৫নং ছবির মতো।

সবশেষে ৫নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ভাবে বাঁ দিকের নীচের কোণটাতে নীচু ভাঁজ দিয়ে দাও। এর প্রান্তটা তীরের নির্দেশ অনুযায়ী বাঁ দিকের ওপরের ভাঁজ করা কোণটার (যেটা সর্ব প্রথম ভাঁজ করা হয়েছে) ভাঁজের তলায় ঢুকিয়ে দাও। ব্যাস্, তাহলেই এটা আটকে যাবে, আর ভাঁজগুলিও খুলে আসতে পারবে না।

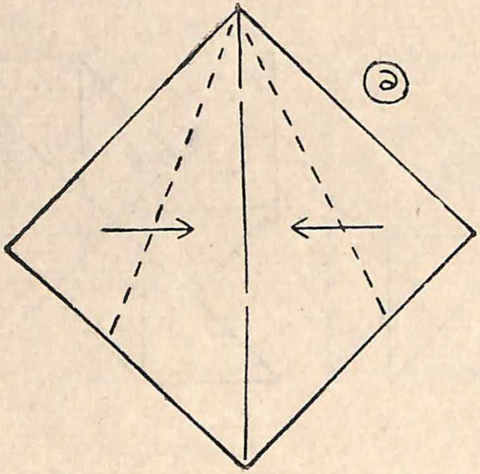
এর ঠিক মাঝখানটায় একটা ফুটো করে তার মধ্যে একটা পিন্ কিংবা একটা সরু কাঠি ঢুকিয়ে দাও। তারপর পিন্‌টা অথবা কাঠিটা হাতে নিয়ে এটা হাওয়ার মধ্যে ধরো তাহলেই দেখবে হাওয়া লেগে তোমার চরকী পাখা ঘুরতে শুরু করেছে—বন্-বন্, শন্-শন্।



⑤



⑥



১

গাছ

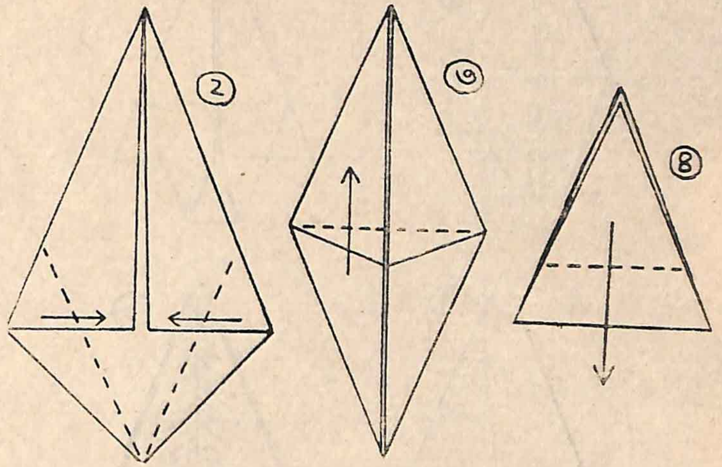
তোমাদের একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করি। বল তো, খাওয়া-দাওয়া করে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, ছোট থেকে বড় হয় অথচ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে মোটেই চলাফেরা করেনা—কী সেটা? আমি জানি একটু ভাবলেই তোমরা ঠিক বলে দিতে পারবে যে, সে জিনিসটা হল—গাছ! আর অনেক দিন আগে জগদীশচন্দ্র বসু যে আবিষ্কার করে গেছেন, গাছেরও প্রাণ আছে—তারাও খাওয়া দওয়া করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয় সে খবর তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এসো, এখন তাহলে কাগজ ভাঁজ করে একটা গাছই বানানো যাক।

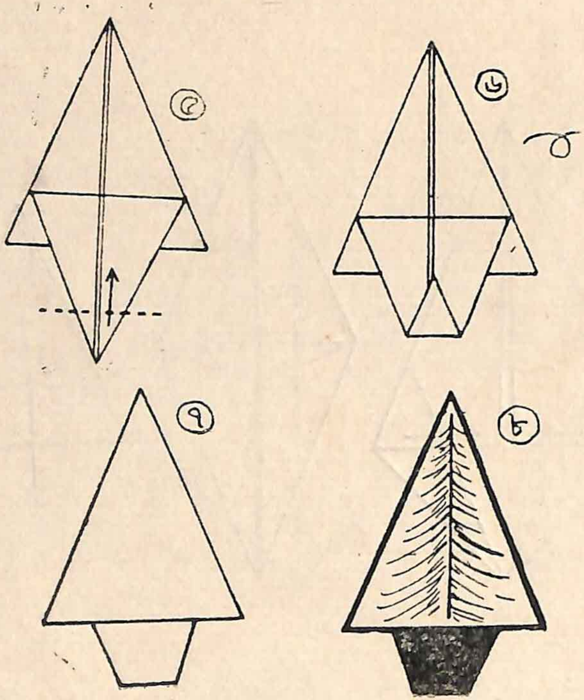
একটা চৌকো কাগজ নিয়ে এর তু'টো পাশ ১নং ছবির মতো নীচু ভাঁজ দিয়ে মুড়ে দাও। তু'টো পাশ যেন ঠিক মাঝখানটাতে এসে মেশে। তাহলে ২নং ছবির মতো চেহারা হলো।

এবার ২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ভাবে তলার দিকের দুটো পাশও নীচু ভাঁজ দিয়ে মুড়ে দাও। এর দুটো পাশও যেন ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় আসে। ভাঁজ করা কাগজটা এখন ৩নং ছবির মতো দেখাবে।

৩নং ছবিতে যেমন মাঝামাঝি জায়গায় নীচু ভাঁজ দেওয়া হয়েছে, সেই রকম নীচু ভাঁজ দিয়ে নীচের অংশটা ওপর দিকে তুলে দাও। এটা এখন ৪নং ছবির মতো হবে।

এইমাত্র যে-অংশটাতে নীচু-ভাঁজ দিয়ে ওপরে তুললে, কেবল কাগজের সেই স্তরটাতেই ৪নং ছবির মতো নীচু-ভাঁজ দিয়ে নীচের দিকে মুড়ে দাও। তাহলে এর চেহারাটা হল—৫নং ছবির মতো।



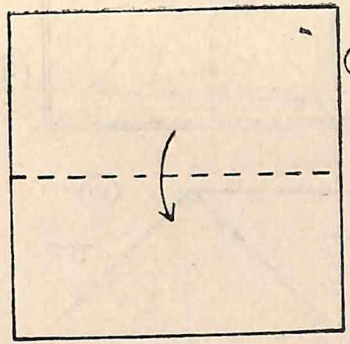


তলার কোণটা ৫নং ছবির নীচু ভাঁজ অনুযায়ী মুড়ে দিলেই এটা ৬নং ছবির মতো দাঁড়াবে। এবার এটা উল্টে অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে এনে নাও। ৭নং ছবির মতো গাছ তৈরী।

৮নং ছবির মতো সবুজ রং দিয়ে গাছের পাতা আর খয়েরী রং দিয়ে তলার দিকটা রং করে নিলেই হলো। আর যদি সবুজ কাগজ দিয়েই গাছটা তৈরী করো, তাহলে কেবল গাছের গোড়াটা রং করলেই চলবে।

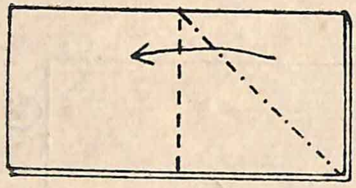
তাঁবু

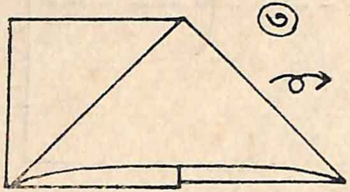
সার্কাস দেখতে কার না ভালো লাগে বলো ? সার্কাসের বিরাট তাঁবুর মধ্যে গায়ে কাঁটা দেওয়া কতো রকম খেলা। আর তার সঙ্গে জোকারের মজার মজার কাণ্ড-কারখানা তো আছেই ! সার্কাসের বিরাট তাঁবুর পেছনেই থাকে খেলোয়াড়দের থাকবার ছোট ছোট সব তাঁবু। এই সব তাঁবুগুলোও কিন্তু দেখতে খু-উ-ব সুন্দর। আর সুন্দর জিনিস দেখলেই আমাদের সেটা কাগজ দিয়ে বানিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। তাই এবার এসো একটা ছোট্ট তাঁবুই বানানো যাক।



এটা বানাতে গেলে চাই একটা চৌকো কাগজ। সবচেয়ে ভালো হয় যদি কাগজটার এক পিঠ সাদা আর অন্য পিঠটা রঙীন হয়। কাগজটা নিয়ে প্রথমে ১নং ছবির মতো মাঝামাঝি

জায়গায় নীচু ভাঁজ দিয়ে দাও। তাহলে ২নং ছবির মতো ভাঁজওয়ালা কাগজ পাওয়া গেল।

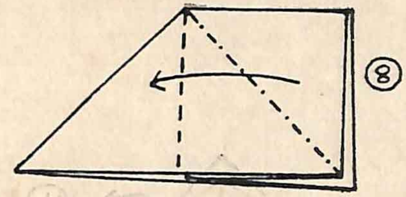

②

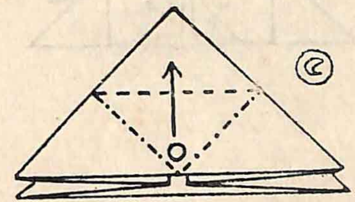

③

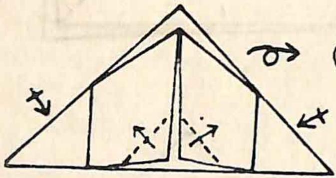
২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে মাঝখানে নীচু ভাঁজ আর কোণাকুণি ভাবে উঁচু ভাঁজ দাও। এই নীচু ভাঁজ আর উঁচু ভাঁজটা কেবল কাগজের ওপরের স্তরটাতেই হবে— নীচের স্তরটাতে নয়। এবার তীরে দেখানো পথ অনুযায়ী কাগজের ওপরের স্তরটাকে নীচু ভাঁজ আর উঁচু ভাঁজের দাগ বরাবর ভাঁজ করে ফেলো। তাহলেই দেখবে কাগজের নীচের স্তরটাতে, কাগজের ওপরের স্তরের কোণাকুণি উঁচু ভাঁজের দাগ বরাবর একটা নীচু ভাঁজ পড়ে গিয়ে এর চেহারাটা ৩নং ছবির মতো হয়ে গেছে। কেবল লেখা পড়লে পরে ব্যাপারটা জটিল বলে মনে হতে পারে, কাগজ নিয়ে করে দেখো ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়। ৩নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজ পাওয়ার পর সেটা উল্টে নাও। অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে

নিয়ে এসো। তাহলে ৪নং ছবির মতো চেহারা পাওয়া যাবে। ৪নং ছবির মতো মাঝখানে নীচু ভাঁজ আর কোনাকুনি উঁচু ভাঁজ দাও। ব্যাপারটা ঠিক ২নং ছবির মতই আর কি। তীরে দেখানো পথ অনুযায়ী ভাঁজটাও ঠিক আগের মতনই করতে হবে। তাহলে এটা দাঁড়াবে ৫নং ছবির মতো।

৫নং ছবির মতো ভাঁজ করবার আর একটা উপায় আছে। ওরিগামির চিহ্ন জানাবার সময়ে, উঁচু ভাঁজ এবং নীচু ভাঁজ শিখিয়ে এই দুটো ভাঁজকেই আরও ভালো ভাবে বোঝানোর জন্য দুটো উদাহরণ দেওয়া আছে। এর দ্বিতীয় উদাহরণটা লক্ষ করো। একটা চৌকো কাগজের ওপর কিছু উঁচু এবং নীচু ভাঁজ দেওয়া আছে। সেই উদাহরণের মতো চৌকো কাগজে উঁচু ভাঁজ এবং নীচু ভাঁজ দিয়ে নিলে পরেই তোমরা ঠিক ৫নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজ পেয়ে যাবে।







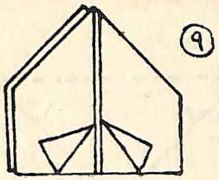
এবার ৫নং ছবিটা লক্ষ করো। সমান ভাবে দেওয়া রয়েছে একটা নীচু ভাঁজ আর কোনাকুনি ভাবে দেওয়া রয়েছে দুটো উঁচু ভাঁজ। দুটো উঁচু ভাঁজ আর একটা নীচু ভাঁজ মিলিয়ে একটা ত্রিভুজের মতো দেখতে হয়েছে। প্রথমে ভাঁজের দাগগুলো খুব ভালো ভাবে দিয়ে নাও। তারপর কাগজের যেখানে গোল চিহ্ন দেওয়া আছে সেই জায়গাটা ধরে কাগজটাকে তীরে দেখানো পথে অর্থাৎ ওপর দিকে তুলে দাও। তাহলেই কাগজটা ভাঁজ হয়ে ৬নং ছবির মতো হয়ে যাবে।

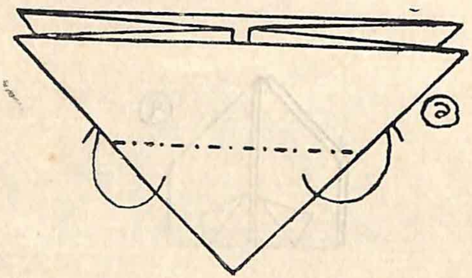
৬নং ছবিতে দেখো মাঝখানে দুটো কাগজ এসে মিশেছে। এই মিশে যাওয়া জায়গাটার তলার দিককার কোণ দুটো কোনা-কুনি ভাবে নীচু ভাঁজ দিয়ে দু-পাশে মুড়ে দাও। ৬নং ছবিতে নীচু ভাঁজ দেওয়ার কোণ দুটি দেখানো হয়েছে। ভাঁজ হওয়ার পর এটাই হলো তাঁবুর দরজা।

৬নং ছবিতে আরও দেখো কাগজের তলার স্তরটাতে কাটা-তীর চিহ্ন দেওয়া আছে। অর্থাৎ কাগজের ওপরের স্তরটাতে যে যে ভাঁজ দেওয়া হলো, তলার স্তরটাতেও ঠিক সেই সেই ভাঁজই দিতে হবে। এটা করার জন্য প্রথমে এটা উল্টে অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে এনে নাও। তাহলে ওপর থেকে এটা দেখতে ৫নং ছবির মতো হবে।

এবার ৫নং ও ৬নং ছবিতে যে-যে ভাঁজ যে-রকম ভাবে দিতে বলা হয়েছে, সেই সেই ভাঁজ সেইরকম ভাবেই দিয়ে দাও। তাহলেই ৭নং ছবির মতো তোমার ছোট্ট তাঁবু তৈরী হয়ে গেল।

আসল তাঁবুর চেয়ে আমাদের কাগজের তৈরী এই ছোট্ট তাঁবুটাই বা কম কিসে ?





প্রজাপতি

সুন্দর সুন্দর প্রজাপতিরা যখন তাদের রং-বেরংয়ের ফুরফুরে ডানাগুলো মেলে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় তখন দেখতে কী ভালোই না লাগে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর 'পাল্কীর' গান পড়োনি ?

> "পের্‌জাপতি হলুদ বরণ
> শশার ফুলে রাখছে চরণ।"

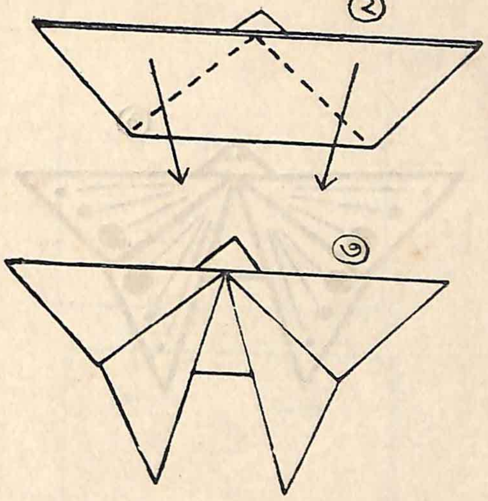
কী চমৎকার বর্ণনা।

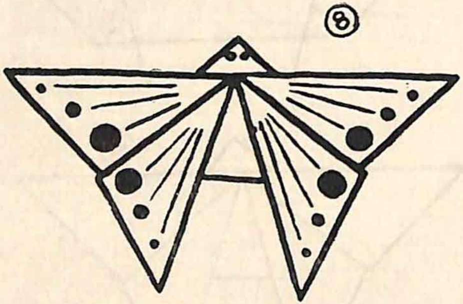
তাহলে এবার এসো আমরা তৈরী করি একটা কাগজের প্রজাপতি।

একটা চৌকো কাগজ নিয়ে সেটা ভাঁজ করতে করতে 'তাঁবু' তৈরীর ৫নং ছবির ধাপ পর্যন্ত এসো। প্রজাপতির ১নং ছবিতে সেটাই দেখানো হয়েছে।

১নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে তলার কোণ-টাতে উঁচু ভাঁজ দিয়ে সেটাকে তলার দিকে ভাঁজ করে দাও। তাহলে এটা ২নং ছবির মতো দেখতে হবে।

এবারে ২নং ছবির দু-পাশের নীচু ভাঁজ অনুযায়ী কাগজের কেবল ওপরের স্তরটাতে দুটো নীচু ভাঁজ দিয়ে কোণ দুটো তলায় নামিয়ে দাও। এর চেহারাটা এখন ৩নং ছবির প্রজা-পতির মতো হলো।



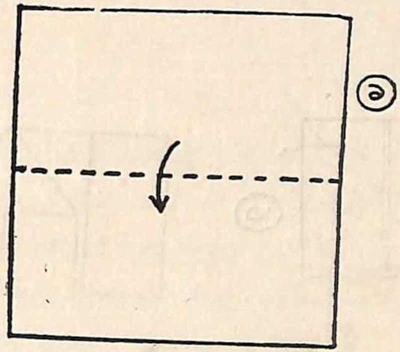


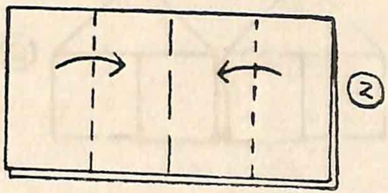
এখন বাকী রইল খালি ৪নং ছবির মতো রং দিয়ে দিয়ে তোমাদের প্রজাপতির ডানা দু'টো রঙীন করে তোলা। সেটা হয়ে গেলে এটা আসল প্রজাপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে।

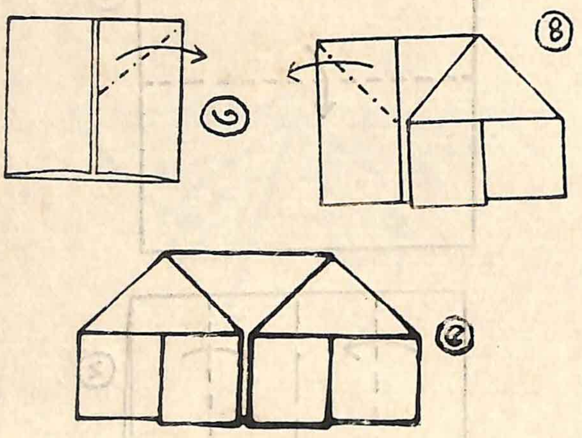
বাড়ি

বাস করতে গেলে বাড়ি তো লাগবেই। আর বাড়ি তৈরী করা কম হাঙ্গামার ব্যাপার নাকি? ইঁট, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, লোহা আরও কত কী হ্যানো ত্যানো জিনিস লাগে তার আর ইয়ত্তা নেই। আমাদের ওরিগামির বাড়িতে কিন্তু এতসব ঝঞ্ঝাট নেই। স্রেফ এক টুকরো চৌকো কাগজ, কয়েকটা ভাঁজ আর রং দিয়ে জানলা-দরজা এঁকে নেওয়া। ব্যাস, বাড়ি তৈরী। তাহলে এসো বাড়ি তৈরীর কাজে লেগে যাই।

যে চৌকো কাগজটা দিয়ে বাড়ি তৈরী হবে তার একটা পিঠ সাদা আর অপর পিঠটা রঙীন হলে খুব ভালো হয়। প্রথমে ১নং ছবির মতো এর ঠিক মাঝখানে নীচু ভাঁজ দিয়ে দাও। ২নং ছবির মতো দেখতে হলো।



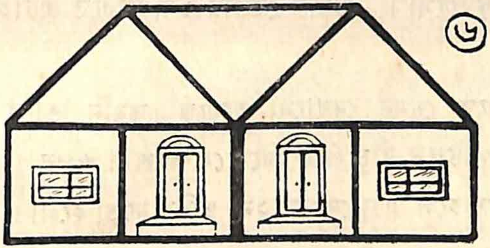




এবার দু-পাশ থেকে ২নং ছবির মতো নীচু ভাঁজ দিয়ে মাঝখানে মুড়ে দাও। দুটো পাশই যেন ঠিক মাঝখানে এসে মেশে। তাহলে ৩নং ছবির মতো চেহারা পাওয়া গেল।

৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি কাগজের ওপরের স্তরে উঁচু ভাঁজ দিয়ে, সেটা তীর দিয়ে দেখানো পথে বাইরের দিকে বার করে দাও। তাহলে কাগজের নীচের স্তরটাতে ওই একই লাইনে নীচু ভাঁজ পড়ে গিয়ে এর চেহারাটা ৪নং ছবির মতো হয়ে যাবে।

এবার ৪নং ছবির মতো অপর দিকটাতেও উঁচু ভাঁজ দিয়ে সেটা আগের মতোই বাইরের দিকে ভাঁজ করে দাও। তাহলে পুরো চেহারাটা ৫নং ছবির মতো দাঁড়াবে।



সব শেষে ৬নং ছবির মতো দরজা-জানলা ইত্যাদি এঁকে দাও। যদি কাগজের ছুটো পিঠ ছু রংয়ের হয়ে থাকে তাহলে বাড়ির ছাতটা আপনা থেকেই অন্য রংয়ের হয়ে যাবে। তা না হলে তোমরা নিজেরাই ছাতটাকে অন্য রং করে দাও।

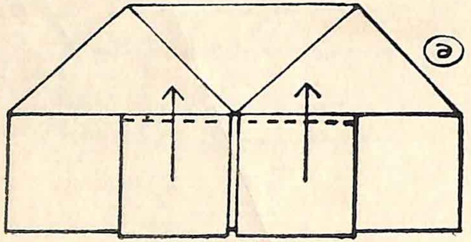
এখন আমাদের কাগুজে বাড়ি পুরোপুরি তৈরী।

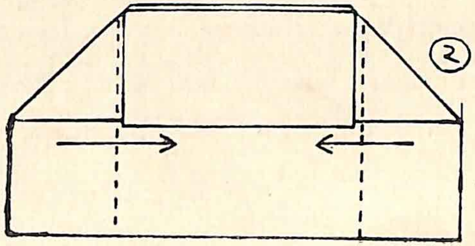
খেলাঘরের চেয়ার

"দিন খাটুনির শেষে বৈকালে ঘরে এসে
আরাম কেদারা যদি মেলে,
গল্পটি মন গড়া, কিছুবা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসে খেলে।"

মানে, ব্যাপারটা হলো একটা আরাম কেদারা বা ইজি চেয়ার পেলে খুবই মজা হয়। কিন্তু এই সময়ে ইজি-চেয়ার কোথায় পাই বলো। অবশ্য ঠিক ইজি-চেয়ার না হলেও, তোমরা এমন একটা খেলাঘরের চেয়ার কাগজ ভাঁজ করে বানাতে পারো, যেটাতে খেলাঘরের পুতুলেরা দিব্যি আরাম করেই বসতে পারবে। এর আগে তোমরা বাড়ি তৈরী করেছো। বাড়ি তৈরী করতে গেলে একটা চৌকো কাগজকে যেমন ভাবে ভাঁজ করতে হয়, ঠিক সেই ভাবে ভাঁজ করতে করতে বাড়ির মডেলের ৫নং ছবির ধাপ পর্যন্ত এসো। চেয়ার তৈরীর ১নং ছবিতে এটাই দেখানো হয়েছে।

১নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে কাগজের ওপরের স্তরটাতে নীচু ভাঁজ দিয়ে সে অংশটা ওপর দিকে মুড়ে দাও। তাহলে এটা দেখতে ২নং ছবির মতো হলো।

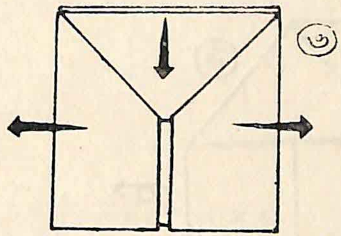


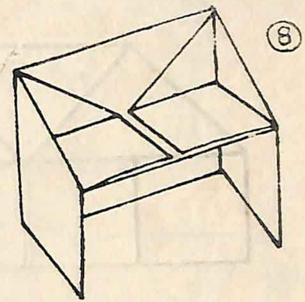


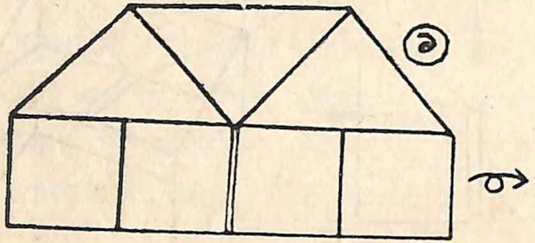
২নং ছবির মতো দুপাশ থেকে কাগজে নীচু ভাঁজ দিয়ে ভাঁজ করে দাও। ভাঁজ হওয়ার পর এর চেহারাটা হবে ৩নং ছবির মতো।

এবারে ওপরের এবং দুপাশের ভাঁজ করা অংশ, ৩নং ছবির মোটা তীরগুলি দিয়ে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ভাবে আবার খুলে দাও। খোলার সময় খেয়াল রেখো পুরো চেয়ারটা যেন ৪নং ছবির হতো হয়।

৪নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছো তোমাদের খেলাঘরের চেয়ারটা তৈরী হয়ে গেছে। যদি একটু শক্ত ধরনের কাগজে তৈরী করো, তাহলে তোমাদের হাল্‌কা পুতুলগুলো স্বচ্ছন্দে এর ওপরে বসতে পারবে।







দাঁত খিঁচোনো খ্যাঁকশেয়ালি

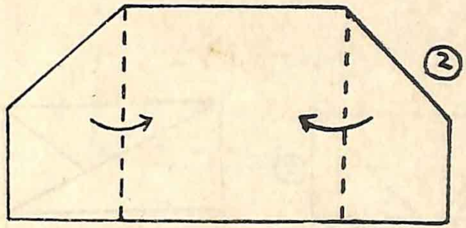
নিন্দুক চণ্ডীবাবুর গল্প তোমরা শুনেছো নাকি ? রবীন্দ্রনাথের 'গল্প-সল্প' পড়লে পরে তোমরা চণ্ডীবাবুর যাবতীয় খবর পেয়ে যাবে। পাড়ার সবাই তার পেছনে ছড়া কাটতো,

"....খ্যাঁক খ্যাঁক করে মিছে
সব তাতে দাঁত খিঁচে,
তারে নাম দিব খ্যাঁকশেয়ালি"

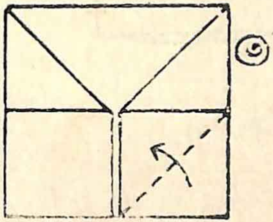
চণ্ডীবাবুকে যে যা খুশি বলুক গে। আমরা কিন্তু কাগজ দিয়ে দাঁত খিঁচোনো একটা খ্যাঁকশেয়ালি বানাতে পারি।

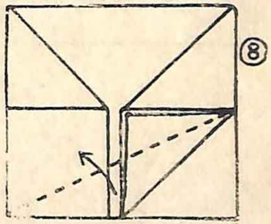
এর আগে বাড়ি বানাতে গিয়ে চৌকো কাগজটাকে যেমন ভাবে ভাঁজ করেছো, সেই ভাবে বাড়ি বানানোর ৫নং ছবির ধাপ পর্যন্ত চলে যাও। খ্যাঁকশিয়ালি বানানোর ১নং ছবিতে সেটাই দেখানো হয়েছে।

এবারে এটাকে উল্টে নাও। অর্থাৎ পেছনের দিকটা সামনে নিয়ে এসো। তারপর ২নং ছবির মতো দুপাশে নীচু ভাঁজ দিয়ে দাও। ভাঁজ হওয়ার পর এর চেহারাটা দাঁড়ালো ৩নং ছবির মতো।

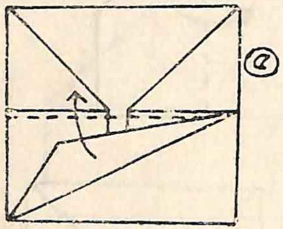


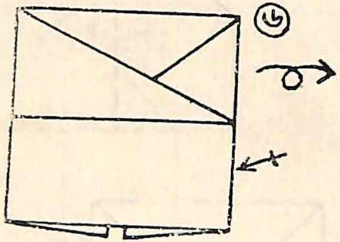
৩নং ছবির ডান দিকের কোণে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি নীচু ভাঁজ দাও। এই ভাঁজটা কেবল কাগজের ওপরের স্তরটাতেই করবে। কোণটা নীচু ভাঁজ দিয়ে তুলে দিলে পরে ৪নং ছবির মতো দেখতে হবে।





4নং ছবিতে এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত যেমন নীচু ভাঁজ দিতে বলা হয়েছে, তেমনি দাও। এটাও আগের মতো কেবল কাগজের ওপরের স্তরটাতেই দেওয়া হবে। তাহলে ৪নং ছবির মতো দেখতে হলো।

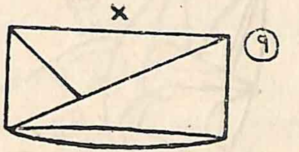




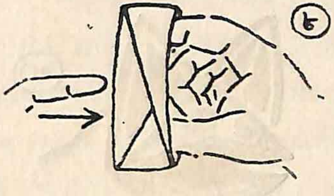
৫নং ছবিতে মাঝামাঝি জায়গায় যেমন নীচু ভাঁজ দেখানো হয়েছে, সেই ভাবে ভাঁজ দিয়ে নীচের অংশটা ওপরে তুলে দাও। এবার এটা দেখাবে ঠিক ৬নং ছবির মতো।

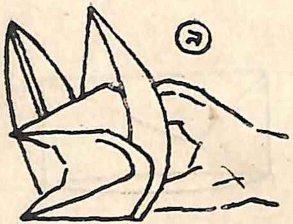
৬নং ছবিতে কাগজের যে অংশে 'কাটা-তীর' চিহ্ন দেওয়া রয়েছে, সেই অংশটাতে ৩নং, ৪নং এবং ৫নং ছবিতে যা-যা করা হয়েছে, ঠিক তাই-ই করতে হবে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে কাছে 'কাটা-তীর' চিহ্নের মানে হলো, ওপরের কাগজে যা যা করা হয়েছে নীচের কাগজেও তাই তাই করা। এটা করার জন্য তোমরা মডেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে অর্থাৎ পেছনটা সামনে এনে ধরবে। মডেলটা উল্টে নিলে ডান দিক এবং বাঁ দিকটা বদলে

যায়। অর্থাৎ আগে যেটা ডান দিকে ছিল এখন সেটা বাঁ দিকে এসে গেল। তাই ৩নং ছবিতে যে ভাঁজটা ডান দিকের নীচের কোণে করা হয়েছে, এবার সেটা বাঁ দিকের নীচের কোণে করতে হবে। ৪নং ছবির ভাঁজটা একেবারে বাঁ দিকের নীচের কোণ থেকে শুরু করে ডান দিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত করা হয়েছিল। এবার সেটা ডান দিকের নীচের কোণ থেকে শুরু করে বাঁ দিকের মাঝামাঝি জায়গা পর্যন্ত করা হবে। ভাঁজ হয়ে গেলে সেটা ৭নং ছবির মতো দেখাবে।



৭নং ছবির তলার দিকটাতে এখন একটা পকেট তৈরী হয়েছে। এই পকেটের মধ্যে বুড়ো আঙুল আর বকুনির আঙুল (শুদ্ধ ভাষায় যেটাকে বলে 'তর্জনী') ভরে দাও। তারপর ৭নং ছবির যেখানে ক্রস্ চিহ্ন রয়েছে, সেই জায়গাটাতে অন্য হাতের তর্জনী দিয়ে চাপ দিতে থাক। ৮নং ছবিতে এই পকেটে আঙুল ঢোকানো আর চাপ দেওয়ার ভঙ্গীটা দেখানো হয়েছে।





৯



১০

ক্রস্ চিহ্ন দেওয়া জায়গাটায় চাপ দিতে থাকলে, সেখানটা ঢুকে যাবে এবং দু-পাশে কান দুটো খাড়া হয়ে উঠবে, ঠিক ৯নং ছবির মতো।

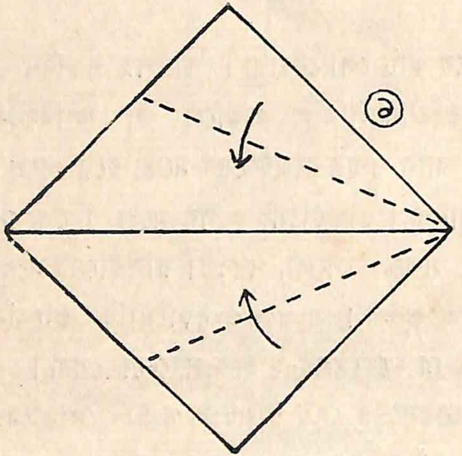
ব্যাস। এবার তোমার দাঁত খিঁচোনো খ্যাকশিয়ালি তৈরী। বাকী শুধু রং দিয়ে কান, চোখ, মুখ, দাঁত এঁকে দেওয়া। মনের মতো রং দিয়ে এগুলো এঁকে ফেলো। ১০নং ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

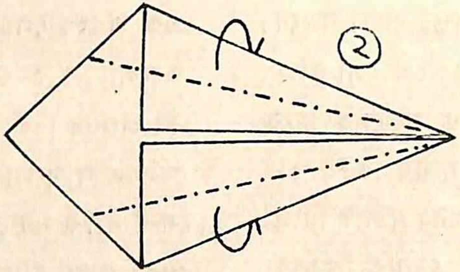
এবার 'তর্জনী' বা বকুনির আঙুল আর বুড়ো আঙুল ফাঁক করলেই খ্যাকশেয়ালি হাঁ করবে। আর এ দুটো আঙুল জোড়া করলেই ও মুখ বন্ধ করবে। এর হাঁ করা আর মুখ বন্ধ করা দেখে কী মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে, "সব তাতে দাঁত খিঁচে, তারে নাম দিব খ্যাকশিয়ালি।"

রাজহাঁস

হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনের লেখা কুচ্ছিৎ হাঁসের গল্পটা তোমরা পড়েছো কি? না পড়ে থাকলে অবশ্যই সেটা পড়বে। হাঁস-মায়ের ঘরে বেঢপ একটা ডিম থেকে জন্মালো কুচ্ছিৎ একটা হাঁসের বাচ্চা। তার চেহারার জন্য সকলেই তাকে ঘেন্না করতো—তাড়িয়ে দিতো। পশু পাখি মানুষ কেউই তার কাছে ঘেঁষতে চাইতো না। যে মেয়েটা হাঁসেদের খাবার দিতো সে তো একদিন লাথিই মেরে দিল তাকে। এমনকি শিকারী কুকুরগুলো পর্যন্ত তাড়া করে এসেও তার বিচ্ছিরি চেহারাটা দেখে দূরে সরে গেল। মনের দুঃখে সে বেরিয়ে পড়লো ঘর ছেড়ে। সব জায়গাতেই খালি অপমান আর নির্যাতন। নানা-ভাবে কত কষ্ট আর দুঃখই না পেল সে। সমস্ত শীতকালটা না খেয়ে উপোস করে কাটালো বেচারা। তারপর একদিন—এক শরৎকালের রোদ-ঝিলিমিলি সকালে সে আবিষ্কার করলো, তার চেহারাটা সুন্দর রাজহাঁসের মতো হয়ে গেছে। কী আনন্দ! কী আনন্দ! রাজহাঁসের দলের মধ্যে মিলে সে খেলতে লাগলো। সকলে বললো, সবকটা রাজহাঁসের মধ্যে সে-ই নাকি সব থেকে সুন্দর! সে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি সুন্দর সুন্দর রাজহাঁসের মধ্যে সেই-ই হবে সবচেয়ে সেরা।

এতো গেলো অ্যাণ্ডারসনের সেই হাঁসটার গল্প। আমাদের কাগজের তৈরী রাজহাঁসটাও কম সুন্দর নাকি? এসো একটুকরো চৌকো কাগজ থেকে আমরা চট্‌পট্‌ এটা তৈরী করে ফেলি।

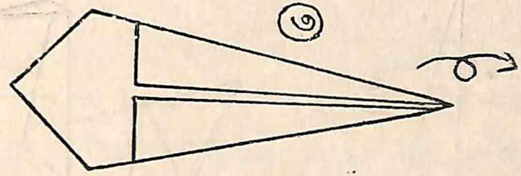


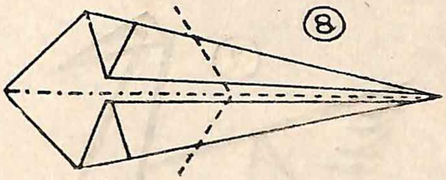


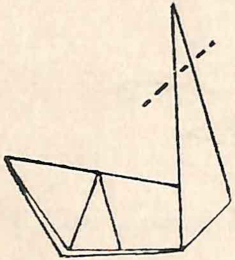
১নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে দু'পাশে নীচুভাঁজ দিয়ে কাগজটার দু'পাশ মুড়ে দাও। দুটো পাশ যেন ২নং ছবির মতো মাঝখানে এসে মেশে।

২নং ছবির মতো দু'পাশে উঁচু ভাঁজ দিয়ে দু'টো পাশকে পেছন দিকে মুড়ে দাও। তাহলে এটা ৩নং ছবির মতো দেখতে হবে। এবার এটা উল্টে নাও। অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে নিয়ে এসো। উল্টোলে পরে ওটা হবে ৪নং ছবির মতো।

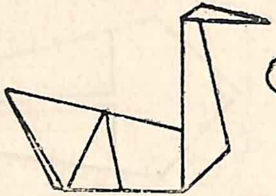
৪নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে ইংরাজী 'ভি' (V) অক্ষরের মতো কোনাকুনি করে নীচু ভাঁজ দাও। এবারে মাঝামাঝি অংশে, কোনাকুনি ভাঁজের বাঁ দিকে উঁচু ভাঁজের এবং ডান দিকের নীচু ভাঁজের দাগ দাও। এই ভাঁজগুলোর দাগে দাগে ঠিক মতো ভাঁজ করে নিলেই সেটা ৫নং ছবির মতো হয়ে যাবে।







৫

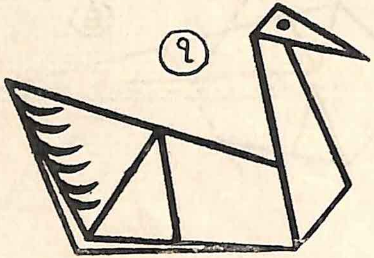


৬

৫নং ছবির ওপরের কোণটাতে যেমন নীচু ভাঁজ দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে ভাঁজ দিয়ে দাও। তাহলেই এটা হয়ে যাবে রাজহাঁসের মাথা আর ঠোঁট। ৬নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছো পুরো হাঁসটাকে।

এবারে ৭নং ছবির মতো রং দিয়ে এঁকে দাও হাঁসের চোখ, ডানা ইত্যাদি। তাহলেই সুন্দর হয়ে উঠবে তোমাদের রাজহাঁস, আর মনে মনে ভাববে, হাঁসেদের মধ্যে সেই-ই বোধহয় সবচেয়ে সেরা।

৭



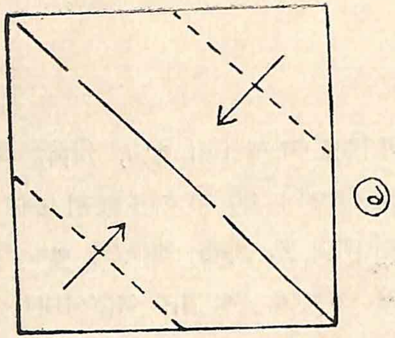
জেট প্লেন

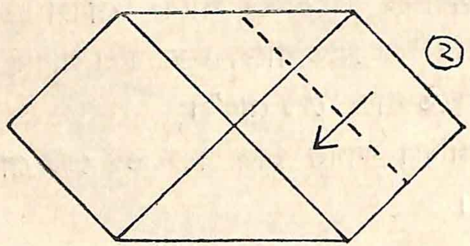
আকাশ দিয়ে যখন প্লেন উড়ে যায় কী সুন্দর লাগে দেখতে। মনে হয় একটা পাখি যেন শব্দ করতে করতে খুব জোরে উড়ে চলে গেল। আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন আকাশ দিয়ে প্লেন উড়ে গেলেই ছড়া কেটে কেটে সেটাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতাম,

উড়ো জাহাজ—উড়ো জাহাজ
ওরে উড়ো পাখি,
একটু নেমে আয়
খোকন তোরে চায়
একটু তারে নিয়ে যাবি নাকি ?

উড়ো জাহাজ কিন্তু সে-কথা না শুনে, দিব্যি নিজের খেয়ালে শোঁ করে চলে যেতো। কী যে রাগ হতো তখন ! পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম যে, প্লেনটা আসলে খুব বিরাট জিনিস। তাই যেখানে সেখানে তো তার আর নামবার উপায় নেই। প্লেন নামার জায়গায়, যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে "বিমান-বন্দর", কেবল সেখানেই এরা নামতে পারে। প্লেনরা তো এমনিতেই তাড়াতাড়ি উড়ে যেতে পারে, এদের মধ্যে আবার খুব তাড়াতাড়ি উড়তে পারে "জেট প্লেন"।

এবার আমরা কাগজ ভাঁজ করে ওই জেট প্লেনই বানাতে শিখবো।





একটা চৌকো কাগজ নিয়ে ১নং ছবির মতো দুটো কোণকে নীচু ভাঁজ দিয়ে ঠিক মাঝখানে মুড়ে দাও। ২ নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজ পাওয়া গেল।

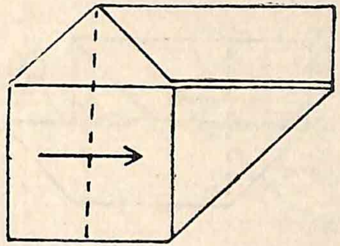
২নং ছবিতে যেমন ডানপাশটাতে নীচু ভাঁজ দিতে বলা হয়েছে, সেই ভাবে ভাঁজ দিয়ে এটাকে ৩নং ছবির মতো করে নাও।

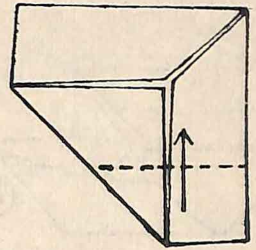
৩নং ছবির মতো বাঁ পাশটাতে নীচু ভাঁজ দিয়ে এর চেহারাটা ৪ নং ছবির মতো করে ফেলো।

৪নং ছবিতে দেখো আবার ডানপাশে নীচু ভাঁজ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো ভাঁজ দিয়ে দিলে এর চেহারাটা ৫ নং ছবির মতো দাঁড়াবে।

৫নং ছবিতে তোমরা এই মাত্র যে ভাঁজটা দিলে, সেই ভাঁজের কাগজের দুটো স্তর আছে। ওপরের স্তরটা একটু সরালেই তলায় পরের স্তরটাতে একটা কোণ দেখতে পাবে। এই কোণটাকে ধরে ৫নং ছবির তীর দিয়ে দেখানো পথে বাইরে বার করে নিয়ে এসো।

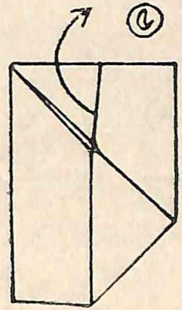
৩

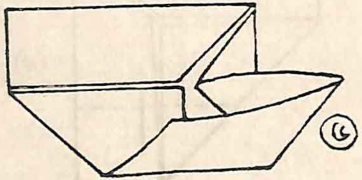




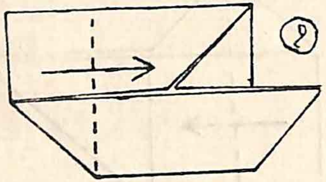
৪

৫





৬

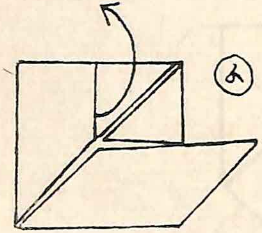


৭

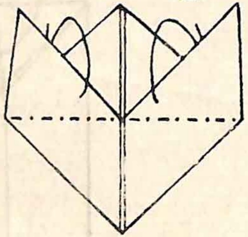
এটা তাহলে ৬নং ছবির মতো বাইরে বেরিয়ে আসবে।

বাইরে বেরিয়ে আসা কোণটাকে বেশ চেপে চেপে বসিয়ে দিলে ৭নং ছবির মতো চেহারা পাওয়া গেল। ৭নং ছবির মতো বাঁ দিকের কাগজটাতেও নীচু ভাঁজ নিয়ে দাও। তাহলে এটা ৮নং ছবির মতো দেখতে হলো।

এবার আগের মতোই ওপরের স্তরটা সরিয়ে তলার স্তরের কোণটা ৮নং ছবির তীর দিয়ে দেখানো পথে বাইরে বার করে আনো। তাহলে এবার ৯নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজ পাওয়া গেল।



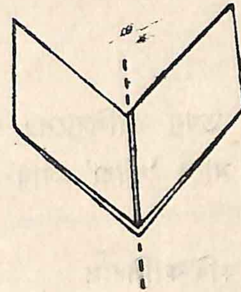
৮



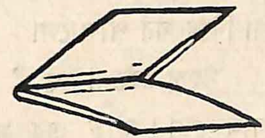
৯

৯নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ভাবে মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু ভাঁজ দিয়ে ওপরের অংশটা পেছন দিকে মুড়ে দাও। তাহলেই ১০নং ছবির মতো জেট প্লেন তৈরী হয়ে গেল।

তৈরী হয়ে গেলে এর মাঝখানটা এবং ডানা দুটো ১১ নং ছবির মতো একটু আঙুল দিয়ে চেপে চেপে বেঁকিয়ে নাও। তারপর সেটা হাতে উঁচু করে ধরে সামনের দিকে ছুঁড়ে দাও। দেখো— তোমার জেট প্লেন কেমন হাওয়ায় ভেসে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গেল।



১০



১১

মাছ

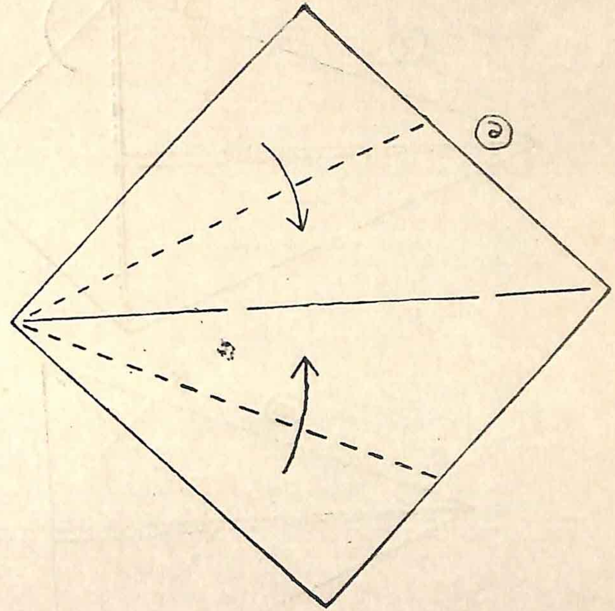
আমি যখন খুব ছোট্ট তখন কালিদাসের একটা হেঁয়ালী শুনেছিলাম। হেঁয়ালী মানে 'ধাঁধা' আর কি। ধাঁধাটা হলো,—

"কহেন কবি কালিদাস
হেঁয়ালীর এই ছন্দ,
জানলা দিয়ে ঘর পালালো
গৃহস্থ রইলো বন্ধ।"

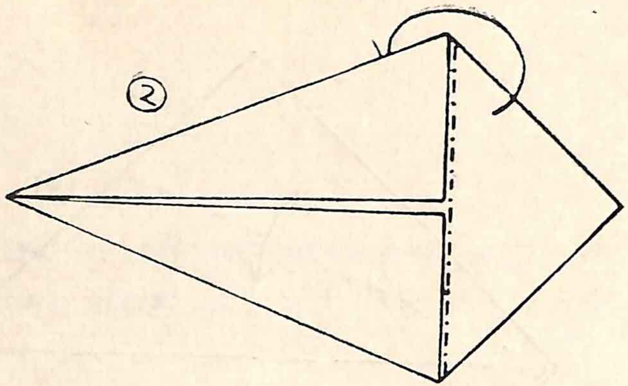
তখন খুব ছোট ছিলাম তো। তাই এর মানেটা বুঝিনি। আসলে ব্যাপারটা কী জানো? জলে রয়েছে মাছ আর সেগুলোকে ধরা হচ্ছে জাল দিয়ে। জালটা যতই টেনে টেনে তোলা হচ্ছে ততই তার মধ্যে থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, আর মাছগুলো আটকা পড়ে যাচ্ছে। মাছেরা হলো গৃহস্থ—জলটা তাদের ঘর। সেই ঘর অর্থাৎ জল বেরিয়ে যাচ্ছে জালের গর্ত দিয়ে অর্থাৎ জানলা দিয়ে। এটাই হলো—"জানলা দিয়ে ঘর পালালো"। "গৃহস্থ রইলো বন্ধ" মানে মাছেরা পড়লো আটকা। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ব্যাপারটা।

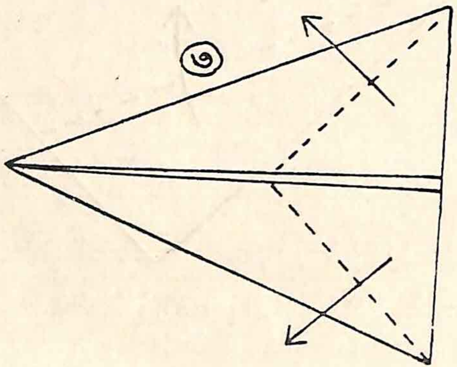
মাছের কথায় মনে পড়লো। একটা কাগজ ভাঁজ করে মাছ তৈরী করলে কেমন হয়? এক টুকরো চৌকো কাগজ পেলেই যখন করা যায় ব্যাপারটা—তখন করে দেখলে মন্দ কী?

১নং ছবির মতো চৌকো কাগজটাকে, দু-পাশ থেকে নীচু ভাঁজ দাও যেন দুটো পাশ মাঝখানে এসে মেশে। ২নং ছবির মতো চেহারা পেলে।



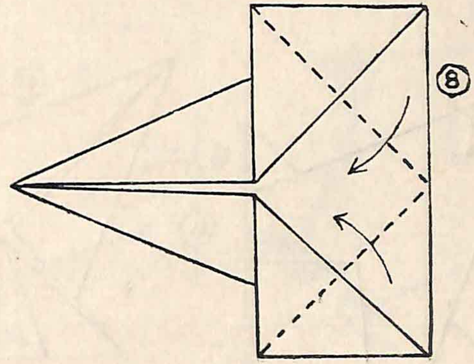
(১)

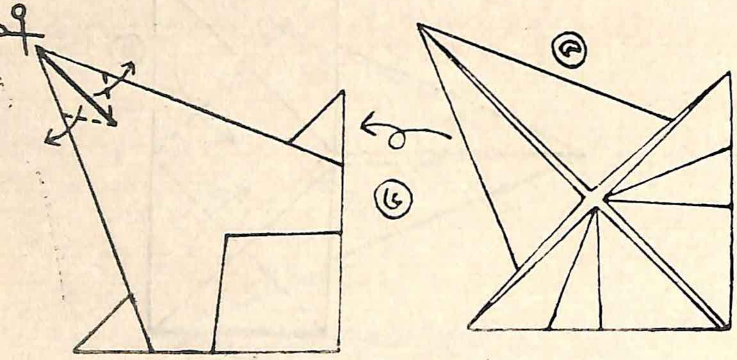




কাগজের ডান দিকের কোণটাকে ২নং ছবির মতো জায়গায় উঁচু ভাঁজ দিয়ে পেছন দিকে মুড়ে দাও। ৩নং ছবির মতো দেখতে হলো।

৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি কোনাকুনি ভাবে দুটো নীচু ভাঁজ দাও কেবল কাগজের ওপরের স্তরটাতে। ওপরের স্তরটা দু'পাশে ভাঁজ হয়ে গেলে এর চেহারাটা হবে ৪নং ছবির মতো।

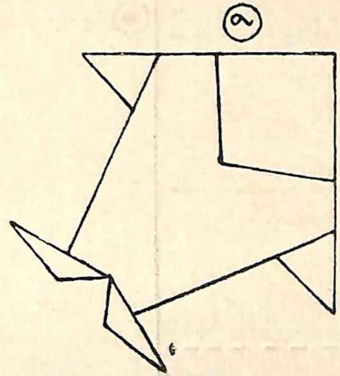


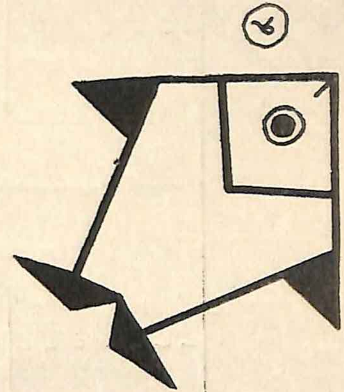


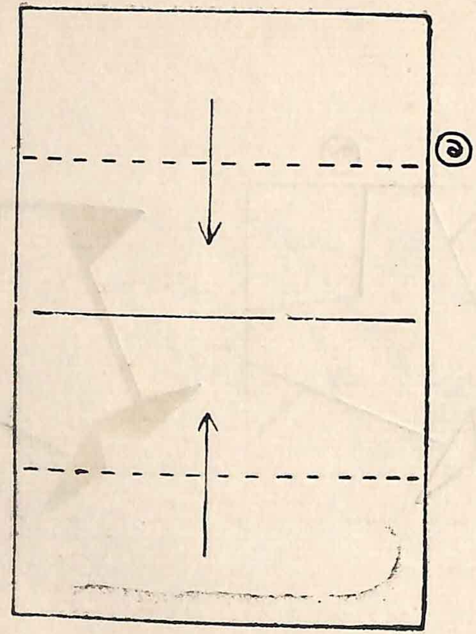
এবার ৪নং ছবির মতো ডান দিকের ওপরের এবং নীচের কোণটাকে নীচু ভাঁজ দিয়ে ভেতর দিকে মুড়ে দাও। যেন ওপরের এবং নীচের ধারটা ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে মেশে। এটা এখন ৫নং ছবির মতো দেখাবে। এটাকে উল্টে দাও অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে নিয়ে এসো। তাহলে এর চেহারাটা হবে ৬নং ছবির মতো।

৬নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে এর বাঁ দিকের কোণটার খানিকটা অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে দু-টুকরো করে ফেলো। তারপর সেই অংশ দু'টোকে ৬নং ছবি অনুযায়ী নীচু ভাঁজ দিয়ে দু-পাশে মুড়ে দাও।

৭নং ছবির মতো পুরোপুরি মাছটা হয়ে গেল তৈরী। এবার বাকী রইলো খালি ৮নং ছবির মতো রং দিয়ে মাছের চোখ, মুখ, লেজ এঁকে দেওয়া। সেটা তোমার ইচ্ছে মতো করে নাও। তাহলেই একটা "বন্ধ হওয়া গৃহস্থ" ধরা পড়লো তোমার কাছে।





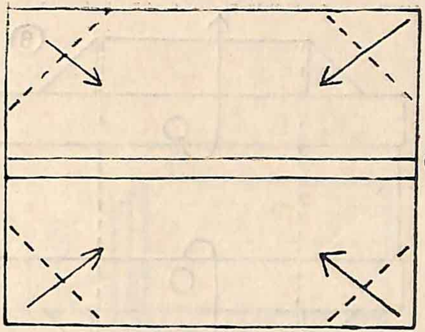


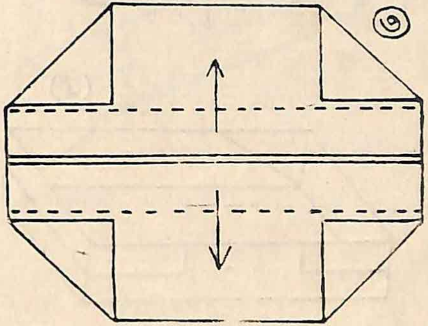
পদিপিসীর বর্মি বাক্স

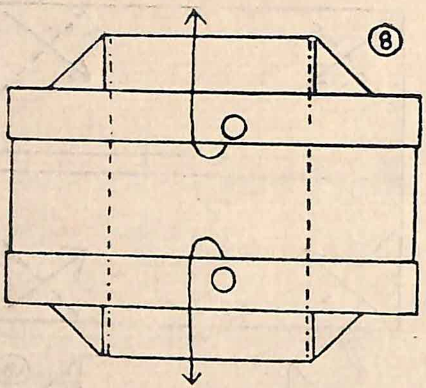
পদিপিসীর যে একটা বর্মি বাক্স ছিল, সেটা বোধহয় তোমাদের মনে আছে। তারপর তো গেল সে বাক্সটা হারিয়ে। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ—কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না সেটা। মেজদিমণির খোকা একশ বছর পরে সেই বাক্স আবিষ্কার করলো "ইতি শ্রীগজার একমাত্র আশ্রয়" ছাদের পায়রাদের রাজত্ব থেকে। আর আজ আমরা পদিপিসীর বাক্সটা তৈরী করবো স্রেফ একটা কাগজ ভাঁজ করে।

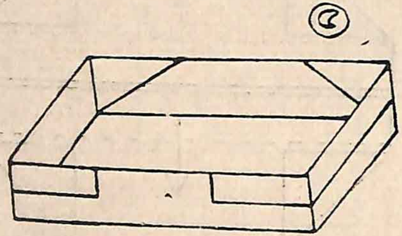
বাক্স তৈরী করতে গেলে যে-কাগজটা লাগবে সেটা ঠিক চৌকো অর্থাৎ লম্বায়-চওড়ায় সমান নয়। এই কাগজটা চওড়ার থেকে লম্বার দিকে একটু বেশী বড় হবে। প্রথমে ১নং ছবির মতো কাগজটার ওপর এবং নীচ দিকে নীচু ভাঁজ দিয়ে মাঝখানে

মুড়ে দাও। দু'টো পাশ যেন ঠিক মাঝখানটায় এসে মেশে। এখন এটা ২নং ছবির মতো দেখতে হবে। ২নং ছবির মতো চারটে কোণে নীচু ভাঁজ দিয়ে মুড়ে দাও যাতে ৩নং ছবির মতো দেখায়।







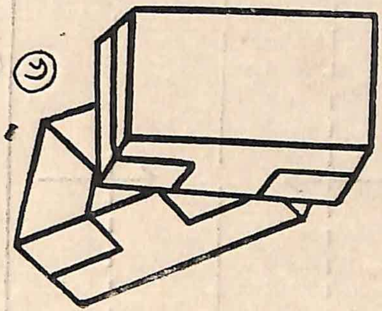


এবার ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে মাঝখানে ছুটো নীচু ভাঁজ দিয়ে মাঝখানে মিশে যাওয়া ছুটো পাশকে ছু-দিকে মুড়ে দাও। তাহলে এর চেহারাটা হবে ৪নং ছবির মতো।

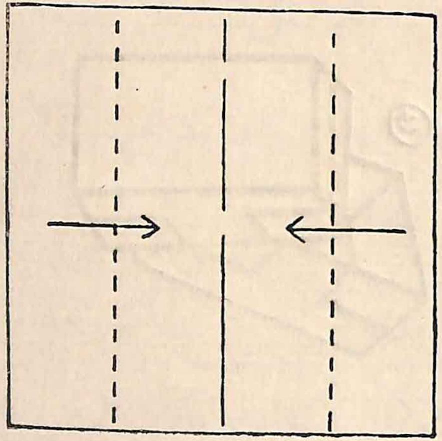
৪নং ছবিটা খুব ভালো ভাবে লক্ষ করো। ছু-পাশেই কাগজের তলার স্তরটাতে নীচু ভাঁজ এবং ওপরের স্তরটাতে উঁচু-ভাঁজের দাগ দাও। তারপর শূন্য চিহ্নিত জায়গাছুটোতে, কেবল কাগজের ওপরের স্তরটাকে ধরে, তীর দিয়ে দেখানো পথে ছু-পাশে টানো। তাহলেই যেখানে যে-রকম ভাঁজ হবার সেটা হয়ে গিয়ে এর চেহারাটা ঠিক ৫নং ছবির মতো হয়ে যাবে।

বাক্সের তলার অংশটা তৈরী হয়ে গেলো। এবারে এটা তৈরী করতে যে সাইজের কাগজ নিয়েছো, লম্বা ও চওড়া দু-দিকেই তার চেয়ে একটু বড় মাপের কাগজ নাও। তারপর তলাটা যেমন ভাবে তৈরী করেছো, বড় কাগজটা দিয়ে ঢাকনাটাকেও ঠিক সেই ভাবেই তৈরী করো। এবারে ৬নং ছবির মতো পুরো বাক্সটা তৈরী হয়ে গেলো।

যদি ইচ্ছে করো তাহলে বাক্সটার ওপরে রং দিয়ে পদিপিসীর বর্মি বাক্সে যেমন ছিলো তেমনি হাঙরমুখো নক্‌শাও করে নিতে পারো। যদি একটু শক্ত কাগজ দিয়ে তৈরী করো তাহলে এই বাক্সে তোমরা সতি সত্যিই তোমাদের পেন্সিল, রবার, চক-এই সব দরকারী জিনিস রাখতে পারবে।



জোড়া নৌকো



ছেলেবেলায় খেলতে খেলতে প্রায়ই আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা আবৃত্তি করতাম,

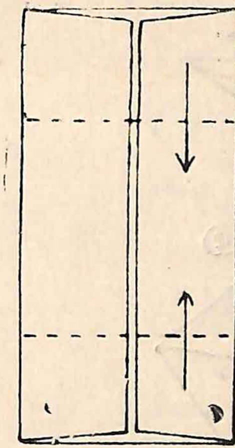
“ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজনৌকা খানি,
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম,
বড়ো বড়ো ক'রে মোটা অক্ষরে,
যতনে লাইন টানি'।”

আমি তখন কাগজের নৌকো বানিয়ে তার ওপরে বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম লিখে, ভাসিয়ে দিতাম বৃষ্টির জলে। তোমরাও বোধহয় তা বানাতে পারো। তাই, তোমরা এখানে যেটা শিখবে, সেটা হলো—জোড়া নৌকো।

একটা চৌকো কাগজ নিয়ে তার দু-'পাশ থেকে ১নং ছবির

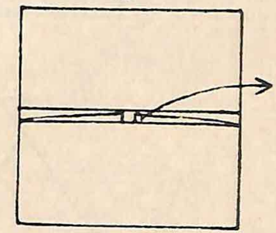
মতো নীচু ভাঁজ দাও। কাগজের দুটো পাশ যেন ঠিক মাঝখানটাতে এসে মেশে। যাতে এ-ব্যাপারটা ঠিক হয়, সেজন্য কাগজটার মাঝখানে আগে থেকেই একটা ভাঁজের দাগ দিয়ে নিতে পারো। দু'-পাশে নীচু ভাঁজ হওয়ার পর সেটা দেখতে হবে ঠিক ২নং ছবির মতো।

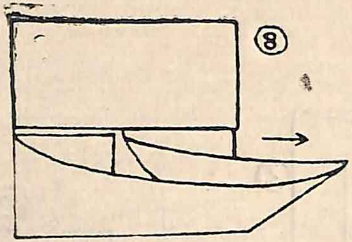
২নং ছবির মতো ওপর এবং নীচে নীচু ভাঁজ দিয়ে, সেই অংশ দুটো সামনের দিকে ভাঁজ করে দাও। এ-অংশ দুটোও যেন ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে মেশে। তাহলে এর চেহারাটা হলো ৩নং ছবির মতো।

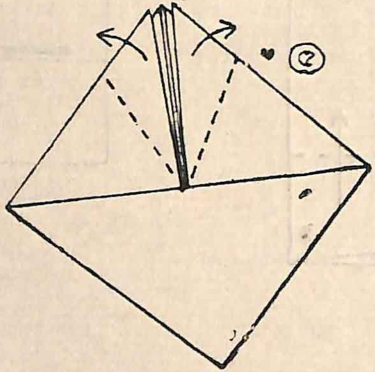


2

৩

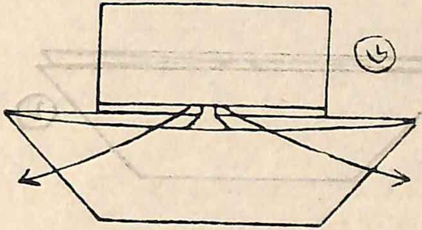


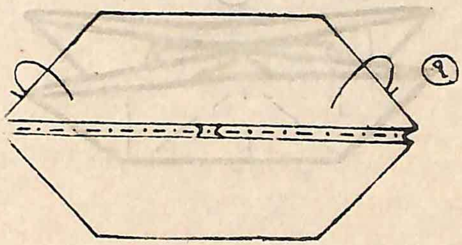


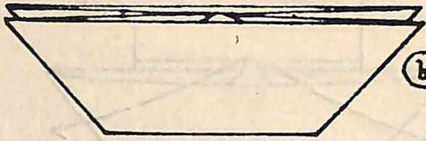


এর পরের ব্যাপারটা একটু ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করো। ৩নং ছবি অনুযায়ী ওপর এবং নীচের দিকটা মাঝখানে এসে মিশেছে। এই জায়গাটায় কাগজের ওপরের স্তরটা একটু সরালেই ভেতরে কাগজের চারটে কোণ এক জায়গায় এসে মিশেছে দেখতে পাবে। ৩নং ছবির তীরের নির্দেশ মতো একটা কোণকে বাইরের দিকে টেনে বার করে নিয়ে এসো। তাহলেই একটা কোণ ৪নং ছবির মতো বেরিয়ে আসবে। এবারে সামনের কাগজটা চেপে সমান করে দিলেই এর চেহারাটা ৫নং ছবির মতো হবে।

৫নং ছবির তীর অনুযায়ী অপর দিকের কোণটাও বার করে দাও। এটা কেমন হবে তা ৬নং ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। যে-দিকের কোণ ছুটি বার করা হলো তার বিপরীত দিকের কোণ ছুটিও একই উপায়ে টেনে বার করে দাও। এই কোণ ছুটিকে বার করার পথ, ৬নং ছবির তীর ছুটিতে দেখানো হয়েছে। তাহলে মোট চেহারাটা হলো ৭নং ছবির মতো।

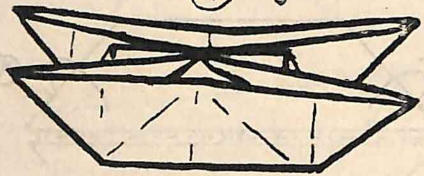






৮

৭



৭নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে মাঝ বরাবর উঁচু ভাঁজ দিয়ে, ওপরের অংশটা পেছন দিকে মুড়ে দাও। ব্যাস। ৮নং ছবির মতো জোড়া নৌকো তৈরী হয়ে গলে।

নৌকোর পকেট দুটো—অর্থাৎ নৌকোর খোল দুটো ৯নং ছবির মতো আঙুল দিয়ে একটু খুলে দাও। দেখো, কী সুন্দর দুটো নৌকো পাশা-পাশি জোড়া রয়েছে এবার কবিতার মতো এর ওপরে তোমার নাম ঠিকানা লিখে জলে ভাসিয়ে দিতেও কোনো আপত্তি নেই। জলের ওপর তোমাদের জোড়া-নৌকো চলবে হেলে-দুলে।

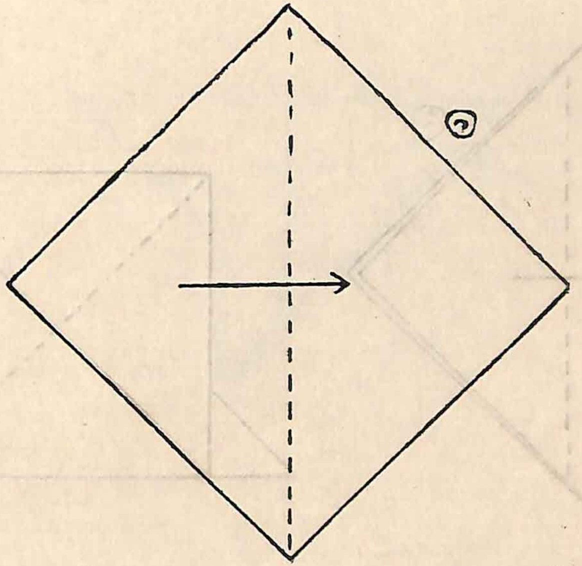
আয়রে আয় টিয়ে

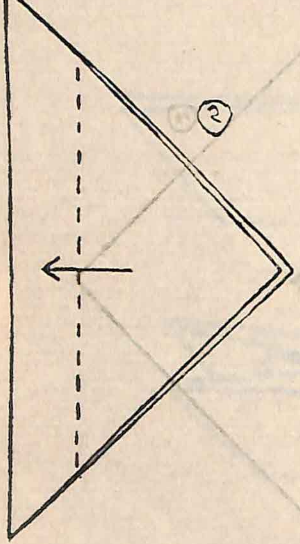
সেই ছড়াটা মনে পড়ছে তো ?

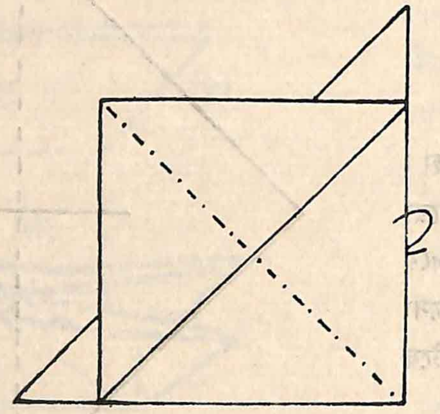
"আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে"

তা নৌকো বানাতে তো ঠিক এর আগেই তোমরা শিখেছো। এবার টিয়েটা বানালেই হয়। যদি একটা সবুজ কাগজের টুকরো পাও তাহলে তো খুব ভালোই। নতুবা সাদা কাগজ দিয়ে বানিয়ে তার পরেও সবুজ রং করে নিতে পারো। এসো তাহলে চটপট শিখে ফেলি কেমন করে বানাতে হয় টিয়ে পাখিটা।

এক টুকরো চৌকো কাগজ নিয়ে ১নং ছবির মতো কোনাকুনি ভাবে ঠিক মাঝখানে ভাঁজ করে ফেলো সেটা। ভাঁজ হয়ে



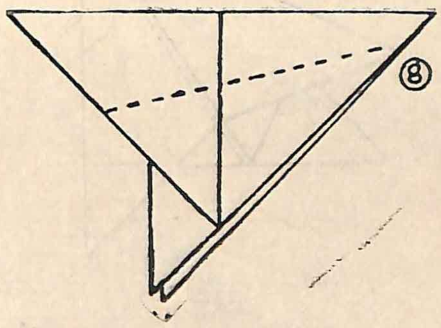




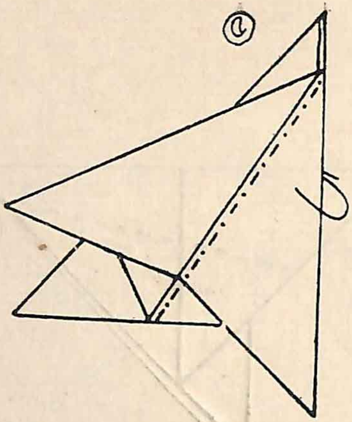
গেলে ২নং ছবির মতো চেহারা পাওয়া যাবে।

৩ এবার ২নং ছবির মতো কাগজের ওপরের স্তরটাতে নীচু ভাঁজ দিয়ে ডান পাশের একটা কোণকে বাঁ দিকে নিয়ে এসো। তাহলে এটা ৩নং ছবির মতো দেখতে হলো।

৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু ভাঁজ দিয়ে ওপরের অংশটা পেছন দিকে মুড়ে দাও। এটা এখন ৪নং ছবির মতো চেহারা নিলো।



৪নং ছবি অনুযায়ী কাগজের ওপরের স্তরটাতে নীচু ভাঁজ দিয়ে

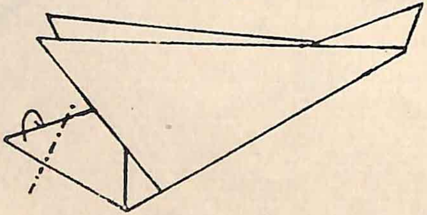


নীচের অংশটাকে ওপর দিকে তুলে দাও। ভাঁজ করা কাগজটা এইবার ৫নং ছবির মতো দেখাবে।

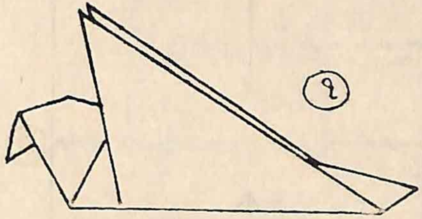
এর ঠিক আগেই কাগজের ওপরের স্তরটাতে যে লাইন বরাবর নীচু ভাঁজ দিয়েছিলে, ঠিক সেই লাইন বরাবর কাগজের নীচের স্তরটাতেও উঁচু ভাঁজ দিয়ে সেটা পেছন দিকে মুড়ে দাও। উঁচু ভাঁজের দাগটা ৫নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছো।

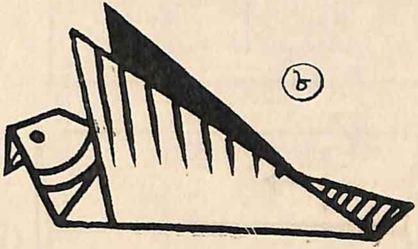
এখন ৬নং ছবির মতো চেহারা পাওয়া গেছে। ৬নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে বাঁ দিকের কোণটাতে উঁচু ভাঁজ দিয়ে মুড়ে দাও। এটা হলো টিয়ের ঠোঁট।

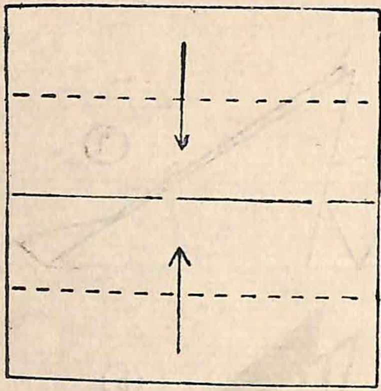
৬



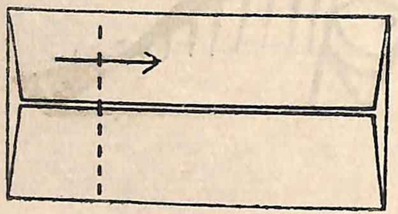
তাহলে ৭নং ছবির মতো পুরো টিয়ে পাখি তৈরী হয়ে গেল। যদি সবুজ কাগজে এটা তৈরী করে থাকো তাহলে তো কথাই নেই। আর যদি সাদা কাগজে তৈরী করে থাকো, তাহলে সবুজ রং দিয়ে পাখিটাকে রঙীন করে নাও। আর একটা কথা, পাখির ঠোঁটটাতে লাল রং দিতে কিংবা কালো রং দিয়ে চোখ আঁকতে মোটেই ভুল কোরোনা যেন। রং-টং করা হয়ে গেলে তোমার টিয়ে পাখি ৮নং ছবির মতো দেখাবে। একেবারে জ্যান্ত পাখির মতো, তবে উড়ে যাবে না এইটুকু রক্ষে।







১



২

একরতি ইঁদুরছানা

সুকুমার রায়ের লেখা ছোট্ট একরতি ইঁদুর ছানার ছড়াটা পড়েছো তো ? আলমারীর কাঠের দেওয়ালের ফাঁকে জন্মালো একটা ইঁদুরছানা। চারপাশের কাঠ ঘেরা জায়গাটা দেখেই সে ভাবলো পৃথিবীটা কতো বড়,—

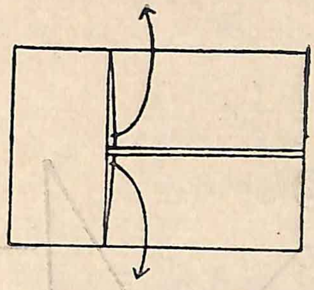
"চেয়ে বলে, মেলি তার গোল গোল আঁখি—
ওরে বাবা ! পৃথিবীটা এত বড় নাকি ?"

এবার আমরা বানাবো ঐ একরতি ইঁদুরছানাটাকে। এটা বানাতে গেলে লাগবে একটুকরো চৌকো কাগজ।

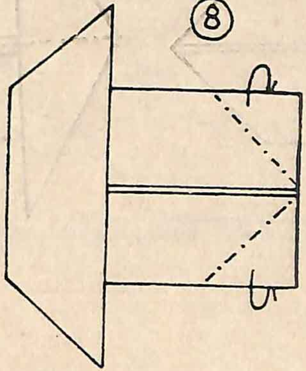
১নং ছবির মতো কাগজটার দুটো পাশে নীচু ভাঁজ দিয়ে মাঝখানের দিকে মুড়ে দাও। যেন দুটো পাশই মাঝখানে এসে মেশে। এটা তাহলে ২নং ছবির মতো দেখতে হলো।

২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে বাঁ পাশটাতে নীচু ভাঁজ দিয়ে ওই অংশটা মুড়ে দাও। তাহলে এর চেহারাটা হবে ৩নং ছবির মতো।

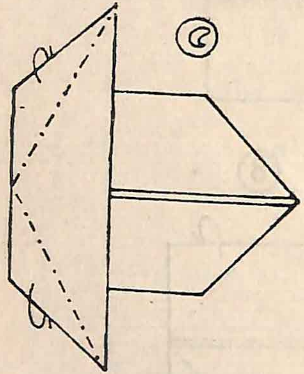
এইমাত্র যে অংশটা ভাঁজ করলে, সেই অংশে কাগজের দুটো স্তর আছে। ওপরের স্তরটা সরালেই দেখতে পাবে নীচের স্তরে কাগজের দুটো কোণ রয়েছে। এই কোণ দুটোকে ৩নং ছবির তীর দিয়ে দেখানো পথে বাইরের দিকে বার করে দাও। এর আগে জোড়া-নৌকো তৈরী করতে গিয়ে তোমরা ঠিক এই ভাবে কোণ বার করেছো। কোণ দুটো বেরিয়ে গেলে ভাঁজ করা কাগজের চেহারাটা ৪নং ছবির মতো হবে।

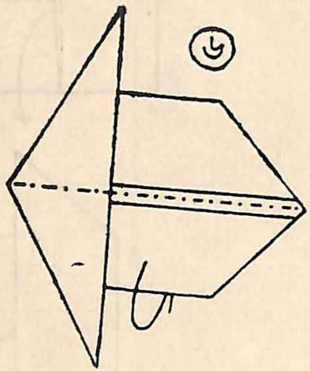


৩



৪





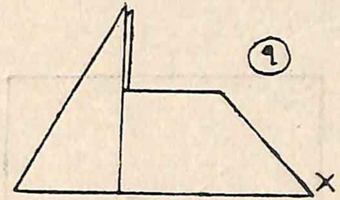
৪নং ছবি অনুযায়ী ডানপাশে কোনাকুনি ভাবে দুটো উঁচুভাঁজ দিয়ে ওপরের এবং নীচের কোণটাকে পেছন দিকে মুড়ে দাও। তাহলে ৫নং ছবির মতো চেহারা পাওয়া গেল।

৫নং ছবিতে দেখো, বাঁ পাশে কোনাকুনি ভাবে দুটো উঁচু ভাঁজের চিহ্ন দেওয়া আছে। সেই দাগ অনুযায়ী উঁচু ভাঁজ দিয়ে ওই অংশ দুটোকে পেছন দিকে মুড়ে দাও। তাহলে আমরা ঠিক ৬নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজ পাবো।

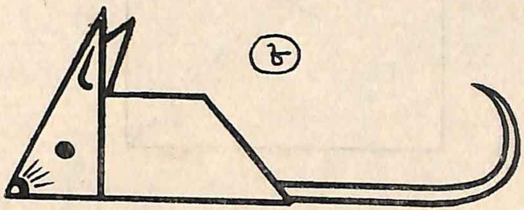
৬নং ছবিতে যেমন মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু ভাঁজ দেওয়া হয়েছে, তেমনি ভাবে উঁচু ভাঁজ দিয়ে তলার অংশটা পেছন দিকে ভাঁজ করে দাও। এবার ভাঁজ করা কাগজটার চেহারাটা হবে ৭নং ছবির মতো।

৭নং ছবির ডান দিকের কোণটা লক্ষ করে দেখো একটা ক্রস (×) চিহ্ন দেওয়া আছে। একটা অন্য কাগজের লম্বা ফালি নিয়ে সেটা সরু করে পাকিয়ে ফেলো। এর একটা প্রান্তকে আঙুল দিয়ে চেপে গোল করে বাঁকিয়ে নাও। এটা হলো ইঁদুরের লেজ। এই লেজটা ক্রস-চিহ্নিত কোণটার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও।

তারপর রং দিয়ে চোখ, নাক, মুখ এঁকে নিলেই ৮নং ছবির মতো একরতি ইঁদুরছানা যেন দৌড়োবার জন্যই রেডি হয়ে গেল।

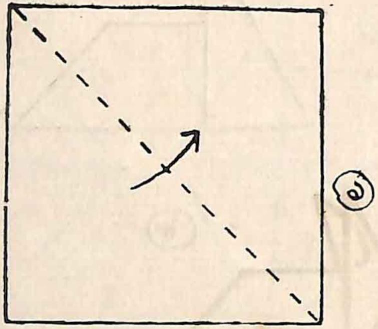


৭


৮

মাছি করে ভন ভন

এবারে তোমাদের একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করি। বলতো সেটা কী, যেটা—

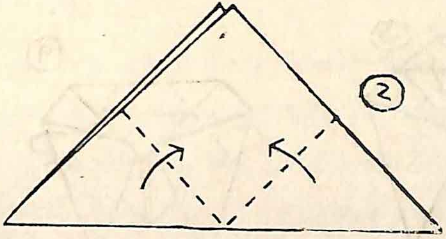


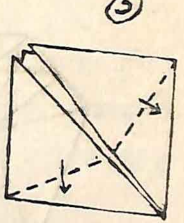
ছয় পায়ে আসে
চার পায়ে বসে
দুই পা ঘসে,
সব চাইতে গরমকাল
বড় ভালোবাসে।

বুঝতে পেরে গেছো ? হ্যাঁ—ঠিক। উত্তরটা হল—মাছি। এবার তোমার সেই ভনভন করা মাছিই কাগজ ভাঁজ করে তৈরী করতে যাচ্ছো।

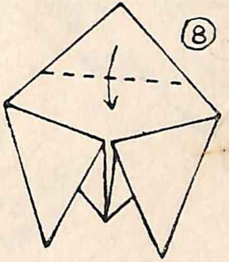
এটা তৈরী করতে গেলে খুব ছোট্ট কালো চৌকো কাগজ হলেই ভাল হয়। তাতে মাছিটাকে অনেকটা জ্যান্ত মাছির মতনই দেখাবে। ১নং ছবির মতো কাগজটাকে নীচু ভাঁজ দিয়ে

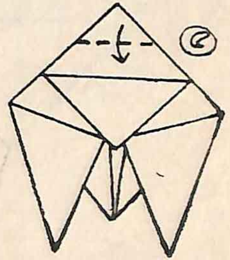
আধাআধি ভাঁজ করে ফেলবার পর, নীচের দু'পাশের দুটো কোণ ২নং ছবির মতো নীচু ভাঁজ দিয়ে ওপর দিকে তুলে দাও।





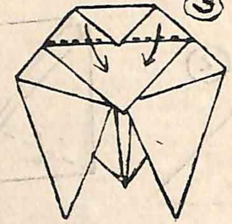
ওপর দিকে তোলা কোণদুটো ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে নীচু ভাঁজ দিয়ে আবার তলায় নিয়ে এসো। ৪নং ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে এখন এর চেহারাটা কেমন হবে। এই কোণ দুটো দিয়েই তৈরী হলো মাছির দুটো ডানা।

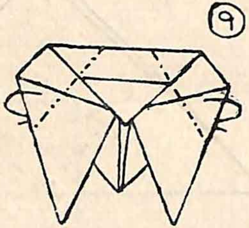


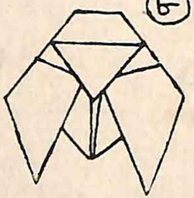


৪নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজের ওপরের কোণটাতে দেখো কাগজের দুটো স্তর রয়েছে। ওপরের স্তরটাতে ৪নং ছবি অনুযায়ী নীচু ভাঁজ দিয়ে তলায় নামিয়ে দাও। এটা দেখতে এখন ৫নং ছবির মতো হলো।

এর ওপরের কোণটাতে এখন কাগজের একটি মাত্র স্তর রয়েছে। সেটাতে ৫নং ছবির মতো নীচু ভাঁজ দিয়ে তলায়







নামিয়ে দাও। তাহলে এর চোহারাটা হবে ঠিক ৬নং ছবির মতো।

কাগজের সেই কোণামোড়া স্তরটাতেই আবার ৬নং ছবির মতো নীচু ভাঁজ দিয়ে তলায় নামিয়ে দাও। এখন ৭নং ছবির মতো চেহারা পাওয়া গেল।

৭নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ভাবে দুপাশে উঁচু ভাঁজ দিয়ে এই অংশ দুটো পেছন দিকে মুড়ে দিয়ে, বেশ করে চেপে দাও।

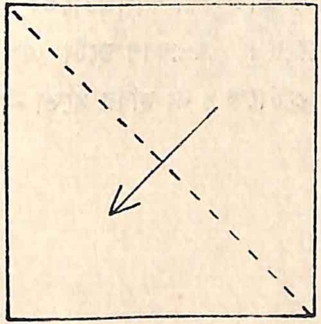
৮নং ছবির মতো পুরোপুরি মাছিটা তৈরী হয়ে গেল।

ছোট ছোট কালো চৌকো কাগজ দিয়ে বেশ কয়েকটা মাছি তৈরী করে নিয়ে, যদি হাল্‌কা রঙের কোনো বোর্ডের ওপরে সেগুলি বসিয়ে দাও, তাহলে একটু দূর থেকেও মনে হবে সত্যি সত্যিই কতকগুলো মাছি বসে আছে।

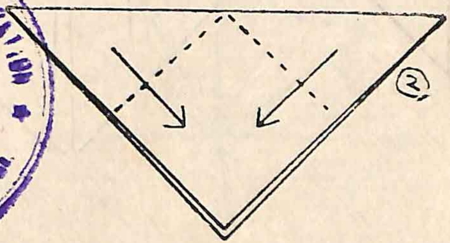
সামুরাই টুপি

কাগজ ভাঁজ করে জিনিস তৈরী করার মজার খেলাটা যে প্রথমে জাপানে শুরু হয় সে কথা তো তোমাদের আগেই বলেছি। এবারে তোমরা একটা খাঁটি জাপানী জিনিস কাগজ ভাঁজ করে তৈরী করতে শিখবে। সেই জিনিসটা হলো—টুপি।

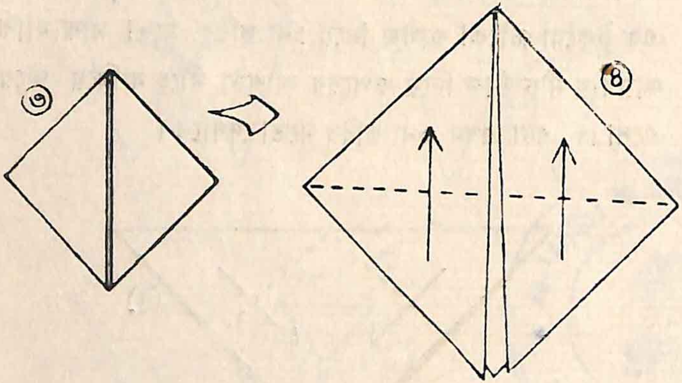
জাপানীরা এই ধরনের টুপির নাম দিয়েছে, 'সামুরাই' টুপি। এক টুকরো চৌকো কাগজ নিয়ে ১নং ছবির মতো মাঝামাঝি জায়গায় নীচু ভাঁজ দিয়ে ওপরের অংশটা নীচে নামিয়ে নিয়ে এসো। এটা এখন ২নং ছবির মতো দেখাবে।



১



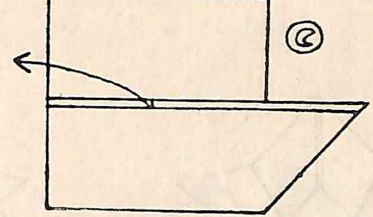
২

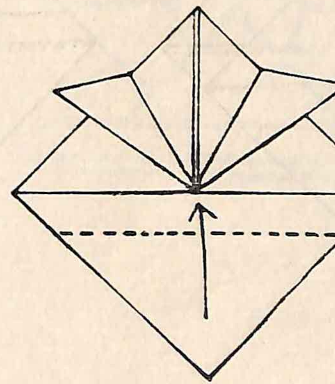


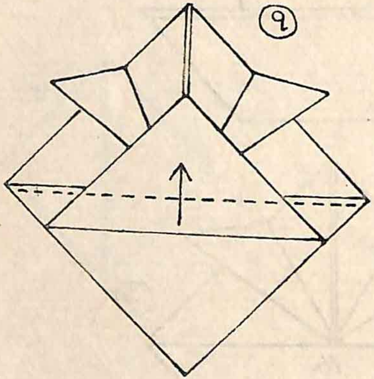
২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে নীচু ভাঁজ দিয়ে দু-পাশের দুটো কোণকে মুড়ে দাও, যাতে এ-দুটো ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে মেশে। এর চেহারা এখন ৩নং ছবির মতো হবে। ৩নং ছবির ভাঁজ করা কাগজটাকেই ৪নং ছবিতে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। যে-কোণ দুটো এই মাত্র ভাঁজ করা হলো সেই কোণ দুটোতে ৪ নং ছবির মতো নীচু ভাঁজ দিয়ে

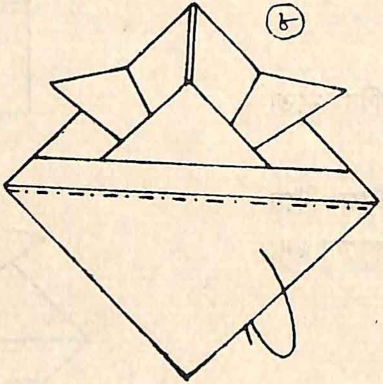
ওপর দিকে তুলে দাও, যাতে এর চেহারাটা ৫নং ছবির মতো হয়।

এই কোণ ছুটোতে এবার ৫নং ছবির মতো নীচু ভাঁজ দিয়ে ছু-পাশে মুড়ে দাও। এর চেহারাটা তাহলে দাঁড়ালো ৬নং ছবির মতো।


৫


৬

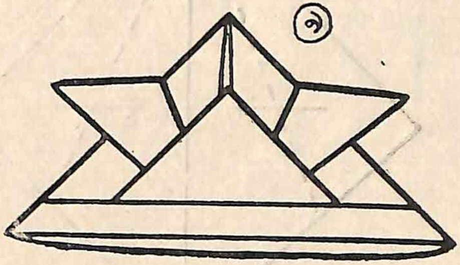


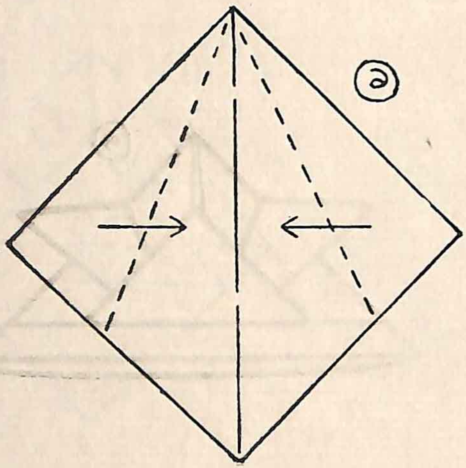


৬নং ছবির নীচু ভাঁজ অনুযায়ী ভাঁজ দিয়ে, তলার কোণটা ওপর দিকে মুড়ে দাও। এই ভাঁজটা কেবল কাগজের ওপরের স্তরটাতেই করা হবে। ভাঁজের শেষে এর চেহারাটা ৭নং ছবির মতো হবে। ৭নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে নীচু ভাঁজ দিয়ে কাগজটা আবার ওপর দিকে তুলে দাও। এর চেহারাটা তাহলে এখন ৮নং ছবির মতো দাঁড়াচ্ছে।

৮নং ছবিতে দেখো নীচের দিকে এখন কাগজের তলার স্তরটা পড়ে রয়েছে। এটাতে ৮নং ছবি অনুযায়ী উচু ভাঁজ দিয়ে পেছন দিকে মুড়ে দাও।

সুন্দর সামুরাই টুপি তৈরী হয়ে গেল। তলার পকেটটাতে আঙুল ঢুকিয়ে ফাঁক করে নাও ৯ নং ছবির মতো। যদি একটু বড় কাগজ দিয়ে তৈরী করো এই সামুরাই টুপি, তাহলে এই পকেটের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিব্যি সেটা পরতে পারবে। রঙীন কাগজ দিয়ে তৈরী হলে টুপিটা সত্যিই ভালো দেখায়। আর যদি সাদা কাগজ দিয়ে তৈরী করো, তাহলে পুরো তৈরী হয়ে যাওয়ার পর দু-তিন রকম রং দিয়ে—এটাকে সাজিয়ে নিতে ভুল কোরো না।





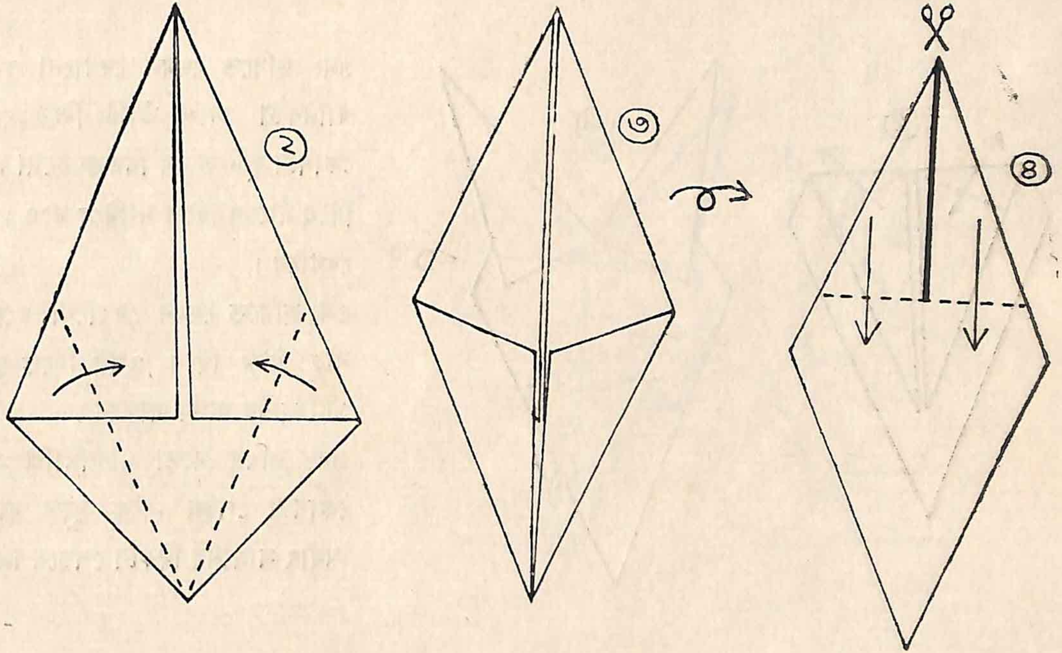
নন্দ ঘোষের গরু

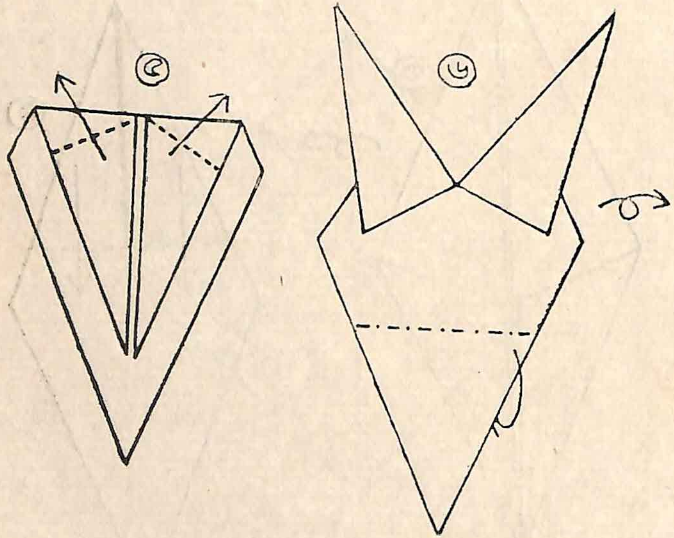
নন্দ ঘোষের দুষ্টু গরুটার কথা তোমাদের মনে পড়ছে নিশ্চয়ই। সুকুমার রায়ের সেই ছড়াটা মনে করে দেখো,

“নন্দ ঘোষের শাম্‌লা গরু
ভাগলো কোথায় লক্ষ্মীছাড়া ?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে
সন্ধানে যায় বস্তি পাড়া ;
শেষ কালেতে অর্ধরাতে
হদ্দ হ’য়ে ফিরলে পরে—
বাসায় দেখে, ঘুমোয় গরু
ল্যাজ গুটিয়ে গোয়াল ঘরে।”

দুষ্টুই হোক আর ভালোই হোক নন্দ ঘোষের গরুর মুখটা

আমাদের বানাতেই হবে। আর সেজন্য চাই এক টুকরো চৌকো কাগজ।
এর আগে গাছ বানাতে গিয়ে যেভাবে কাগজ ভাঁজ করেছো, সেই ভাবে গাছের ৩নং ছবির ধাপ পর্যন্ত ভাঁজ করে নাও। এখানেও ১নং, ২নং ও ৩নং ছবিতে সেই ভাঁজগুলিই দেখানো হয়েছে। এটাকে উল্টে নাও অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে নিয়ে এসো—তাহলে ৪নং ছবির মতো দেখাবে।





৪নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে ওপর থেকে খানিকটা অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে দাও। তাহলে ওপরের কোণটা দুটি ভাগে বিভক্ত হলো। এই দুটি ভাগকেই নীচু ভাঁজ দিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে দাও। তাহলে এটা ৫নং ছবির মতো দেখাবে।

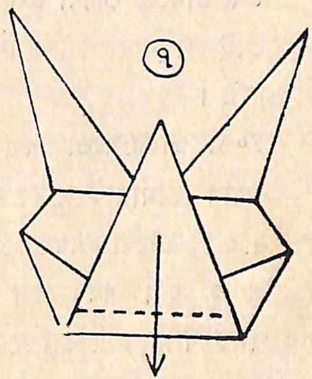
৫নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে দুটি অংশেই নীচু ভাঁজ দিয়ে ওপর দিকে তুলে দাও। এটা দেখতে এখন ৬নং ছবির মতো লাগবে।

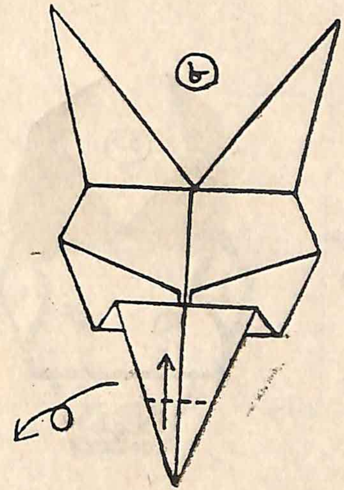
৬নং ছবির মতো মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু ভাঁজ দিয়ে নীচের কোণটা পেছন দিকে মুড়ে দাও। তারপর সেটা উল্টে দাও অর্থাৎ সামনের দিকটা পেছনে নিয়ে যাও।

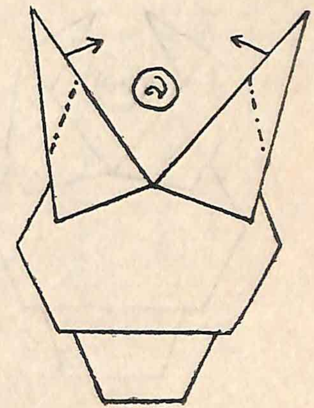
এবার এর চেহারাটা হলো ৭নং ছবির মতো।

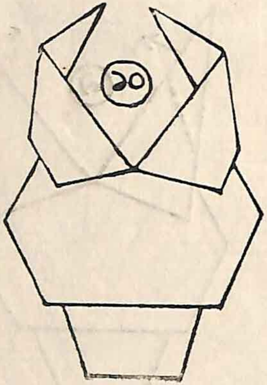
এইমাত্র যে অংশটা মোড়া হলো তার নীচের দিকে ৭নং ছবির মতো নীচু ভাঁজ দিয়ে কোণটা তলার দিকে নামিয়ে দাও। এবার এটা ৮নং ছবির মতো হলো।

তলার কোণটাতে ৮নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে নীচু ভাঁজ দিয়ে ওপর দিকে মুড়ে দাও। এবার পুরো ভাঁজ করা কাগজটা উল্টে দিলে অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে নিয়ে এলে ৯নং ছবির মতো দেখাবে।











৯নং ছবিতে দেখো ওপরের কোণ দুটোতে উঁচু ভাঁজ দেওয়া। সেই অনুযায়ী ভাঁজ দিয়ে কোণ দুটোকে পেছন দিকে মুড়ে দাও।

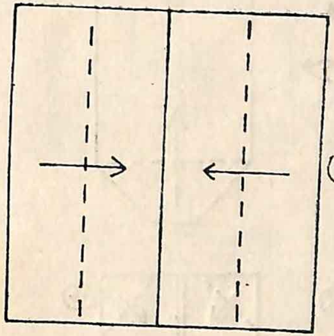
১০ নং ছবির মতো গরুর মুখ তৈরী হয়ে গেলো।

এবার তোমার ইচ্ছেমত রং দিয়ে শিং, কান, চোখ, নাক এঁকে নাও। দেখো এখন ১১নং ছবির মতো দেখাচ্ছে গরুটাকে। অবশ্য এটা এখন নন্দ ঘোষের গরুটার মতো ঘুমোচ্ছেনা— প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রয়েছে।

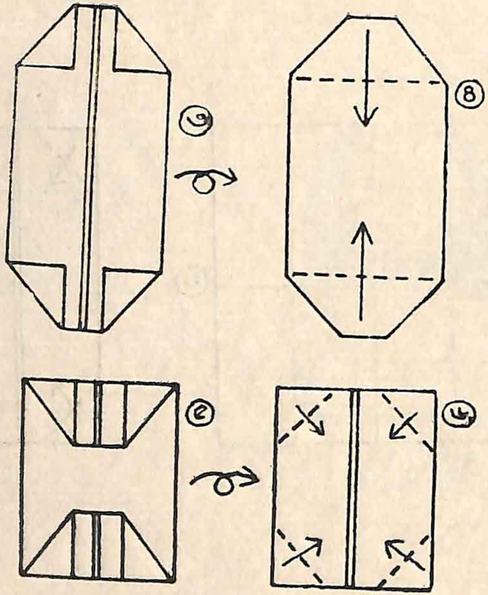
জাপানী লণ্ঠন

সবচেয়ে শেষে কাগজ ভাঁজ করে তোমরা যেটা বানাতে শিখবে সেটাও একটা জাপানী জিনিস। জাপানী জিনিস হলেও বড় দিনের সময় এটা আমাদের এখানেও হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। জিনিসটা হলো—জাপানী লণ্ঠন (অনেকে অবশ্য চীনে লণ্ঠনও বলেন একে) এখন এই লণ্ঠনই বানাতে শিখবো আমরা। একটুকরো রঙীন চৌকো কাগজ নিয়ে তোমরা রেডি হয়ে নাও।

প্রথমে ১নং ছবির মতো কাগজটার দু-পাশে নীচু ভাঁজ দিয়ে, মাঝখানে মুড়ে দাও। লক্ষ রেখো যেন দুটো পাশ এসে ঠিক মাঝখানটায় মিশে যায়। ২নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজ পাওয়া গেল।







২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে চারটে কোণে নীচু ভাঁজ দিয়ে ভেতর দিকে মুড়ে দাও। তাহলে এর চেহারাটা হবে ৩নং ছবির মতো।

৩নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজটাকে উল্টে দাও, অর্থাৎ পেছন দিকটা সামনে নিয়ে এসো, যাতে এটা ৪নং ছবির মতো দেখায়।

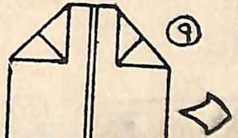
৪নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে ওপরে এবং নীচে নীচু ভাঁজ দিয়ে অংশ দুটোকে তীর দিয়ে দেখানো পথে মুড়ে দাও। এবার এটা ৫নং ছবির মতো দেখতে হলো।

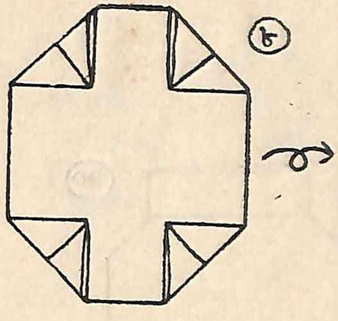
৫নং ছবির মতো ভাঁজ করা কাগজটাকে উল্টে দিয়ে পেছন দিকটা সামনে নিয়ে এসো। পেছন দিকটা সামান এলে এটা ৬নং ছবির মতো দেখতে লাগবে।

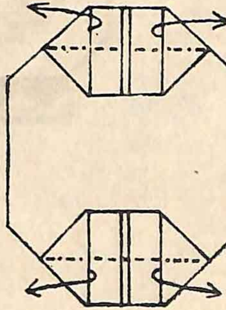
৬নং ছবির মতো চারটে কোণে নীচু ভাঁজ দিয়ে, কোণ চারটেকে ভেতর দিকে মুড়ে দাও। এর চেহারাটা এখন হবে ঠিক ৭নং ছবির মতো। ৭নং ছবির ভাঁজ করা কাগজটার চেহারাটাই বড়ো করে ৮নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

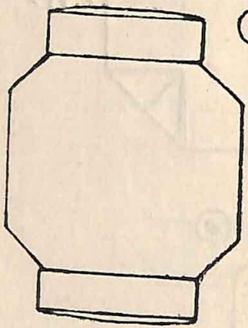
এই ভাঁজ করা কাগজটাকে উল্টে ফেলো, অর্থাৎ এর পেছন দিকটাকে সামনে নিয়ে এসো। পেছন দিকটা সামনে এলে এর চেহারাটা ৯নং ছবির মতো দেখাবে।

৯নং ছবিটা খুব ভালো ভাবে লক্ষ করো। ওপর এবং নীচের অংশের দু-পাশে দুটো করে ত্রিভুজের মতো তৈরী হয়েছে। এই ত্রিভুজের ওপরের অংশটাতে ৯নং ছবির মতো উঁচু ভাঁজের দাগ দাও। দুটো ত্রিভুজের মাঝের অংশটাতে একই লাইনে নীচু ভাঁজের দাগ দাও। ওপর এবং নীচ দুটো অংশেই এই

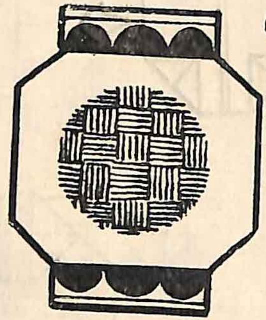

৭


৮


৯



১০



১১

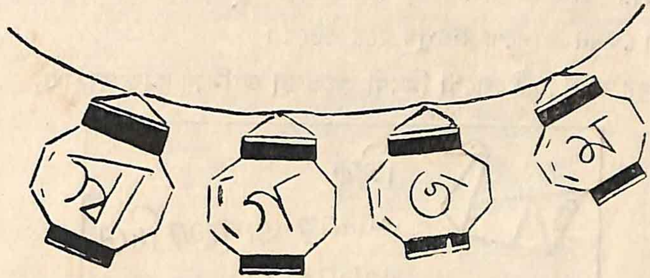
রকম করো। এবার যেমন তীর দিয়ে দেখানো হয়েছে, সেই ভাবে দু-পাশের দুটো ত্রিভুজের কাগজের ওপরের স্তরটাকে বাইরের দিকে টেনে দাও। তাহলেই ভেতরের অংশটাতে নীচু ভাঁজ পরে গিয়ে এর চেহারাটা ১০ নং ছবির মতো হয়ে যাবে।

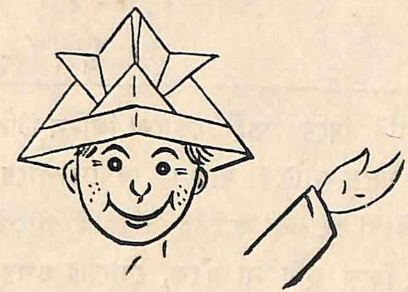
১০ নং ছবিতে পুরোপুরি লণ্ঠনের চেহারাটা দেখানো হয়েছে। এবারে এর ওপরে ১১নং ছবির মতো, রং আর নক্‌শা করে নাও। একটু বড় কাগজ দিয়ে লণ্ঠনটা তৈরী করলে পরে, এটা তোমরা সুতো বেঁধে টাঙিয়ে রাখতে পারো।

ওরিগামি লাগে কিসে

ওরিগামির সাহায্যে তোমরা অনেক জিনিস বানাতে শিখলে। এগুলো বানিয়ে রঙে সাজিয়ে রাখলে খুব সুন্দর দেখাবে। দোকানের কিনে আনা খেলনার চেয়ে নিজের হাতে তৈরী জিনিস দিয়ে ঘর সাজালে, ভালো যেমন দেখায়, আনন্দও পাওয়া যায় আরও বেশী।

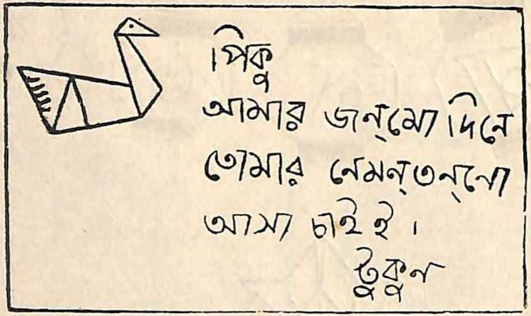
ওরিগামির জিনিষগুলোকে তোমরা নানা ভাবে ব্যবহার করতে পারো। জন্মদিন কিংবা অন্য কোনো উৎসবে তোমরা দোকান থেকে কিনে আনা কাগজের টুপি পরো তো? তা না কিনে নানা রং-এর সামুরাই টুপি তৈরী করে নিয়ে সবাই মিলে পরো। দেখো উৎসব কেমন রঙীন হয়ে ওঠে। কিংবা রঙচঙে কাগজ দিয়ে বড় বড় করে চারটে জাপানী লণ্ঠন তৈরী করো। তাতে রং দিয়ে 'স্বাগতম' কথাটা লিখে উৎসব বাড়িতে দরজায়





টাঙিয়ে দাও। জন্মদিনই হোক আর পুজোই হোক, দেখো সেটা কেমন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠবে।

বন্ধুদের যখন চিঠি লেখো কিংবা শুভেচ্ছা জানিয়ে কার্ড পাঠাও,



তখন ওরিগামি দিয়ে তৈরী কোনো জিনিস চিঠি বা কার্ডের পাশে আঠা দিয়ে আটকে দাও। দেখতে পাবে তোমাদের লেখা চিঠি কিংবা শুভেচ্ছা কার্ডের চেহারাই পাল্টে যাবে। পুরোপুরি রং দিয়ে ছবি না এঁকে, বোর্ডের ওপর ওরিগামির জিনিস আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়েও তোমরা ছবি তৈরী করতে পারো। আরও মজার ব্যাপার হতে পারে, তোমাদের জানা অনেক গল্প, কবিতা, ছড়ার বিষয়টাকেও তোমরা এইরকম ওরিগামির ছবির মধ্য দিয়ে যদি ফুটিয়ে তোলো। যেমন ধরো, সুকুমার রায়ের 'নাচন' কবিতাটা,

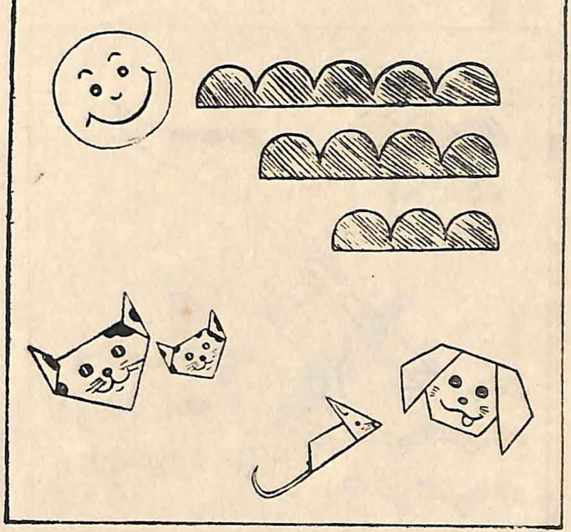
"নাচ্ছি মোরা মনের সাধে গাচ্ছি তেড়ে গান
হুলো মেনী যে-যার গলায় কালোয়াতীর তান।
নাচ্ছি দেখে চাঁদা-মামা হাস্‌ছে ভরে গাল
চোখটি ঠেরে ঠাট্টা করে দেখ্‌না বুড়োর চাল।
ইঁদুর দেখে মাম্‌দো কুকুর বল্‌লে তেড়ে হেঁকে—
বল্‌ব কি আর, বড়ই খুশি হলেম তোরে দেখে।"

বেড়াল, কুকুর, ইঁদুর এসবগুলো ওরিগামি দিয়ে তৈরী করে বোর্ডে আটকে এই কবিতার ব্যাপারটা দেখাতে পারো। আকাশের চাঁদ, মেঘ এগুলো তোমরা 'কিরিগামি' দিয়ে তৈরী

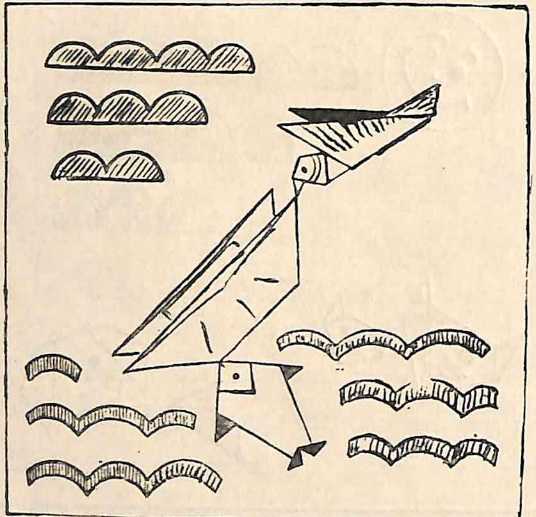
করে নিতে পারো। কিরিগামি শুনে আবার ঘাবড়ালে নাকি ? কিরিগামি হচ্ছে কাগজ কেটে কেটে কোনো জিনিস তৈরী করা। তার মানে, হলদে রং এর কাগজ কেটে যদি তোমরা চাঁদ তৈরী করো সেটাই হবে কিরিগামি। সবটা তৈরী হয়ে গেলে পরে সুকুমার রায়ের কবিতাটা তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। কিংবা, ধরো ওই ছড়াটা,

"আয়রে আয় টিয়ে
নায় ভরা দিয়ে
না নিয়ে গেলো বোয়াল মাছে"

এটাও তোমরা ওরিগামির টিয়ে, নৌকো, মাছ দিয়ে দেখাতে পারো। এতেও মেঘ আর জল তোমরা কিরিগামি দিয়ে অর্থাৎ কাগজ কেটে তৈরী করতে পারবে। কাগজ কেটে



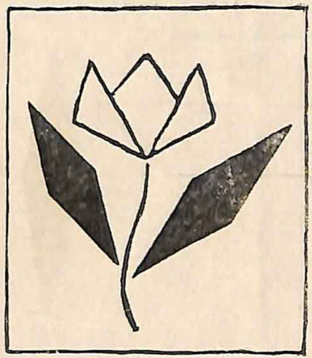
9760

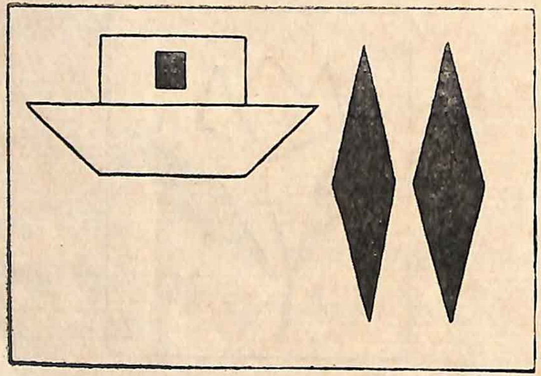


কেমনভাবে চাঁদ, মেঘ, জল তৈরী করতে হবে সেটা তোমরা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। কাটা হয়ে গেলে এগুলো আঠা দিয়ে জায়গা মতো বোর্ডে আটকে দেবে। 'নাচন' কবিতার চাঁদের চোখমুখ অবশ্য চাঁদটা কেটে আটকে দেওয়ার পর রং দিয়ে এঁকে দিতে হয়। কিরিগামির সাহায্যে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আর নকশা কাটা যায়, তা পরে আরও বেশী করে তোমাদের জানানোর ইচ্ছা রইলো।

এখানে যেসব জিনিস তৈরী করতে শেখানো হয়েছে, সেগুলোকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিলে পরেই তোমরা আরও অনেক কিছু তৈরী করতে পারবে। তার জন্য বুদ্ধিটা একটু খাটাতে হবে আর কি। যেমন ধরো, একটা লাল কিংবা গোলাপী রং এর চৌকো কাগজ নিয়ে সেটাকে 'হাবুদের কুকুরে'র ৩নং ছবির মতো ভাঁজ করো। এটা ঘুরিয়ে অর্থাৎ

তলার দিকটা ওপরে এনে একটা বোর্ডে আঠা দিয়ে আটকে দাও। এর একটু তলায় দু-পাশে সবুজ রংয়ের কাগজ দিয়ে তৈরী 'গাছে'র ৩নং ছবির মতো ভাঁজ করা দুটো কাগজ আটকে দাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনিভাবে মাঝখানে রং দিয়ে একটা দাগ টেনে দাও। ব্যাস, একটা ফুল হয়ে গেল—যার দু-পাশে দুটো পাতা। এ-রকম আরও কত কি তোমরা বানাতে পারো যদি একটু বুদ্ধি খরচা করো। আর বুদ্ধি এমন একটা জিনিস যা খরচা করলে মোটেই কমেনা—বরং বেড়েই চলে।





এবার একটা ধাঁধা দিই। পাশের ছবিটা ছ্যাখো। এতে যে-দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছো সেটা তৈরী হয়েছে, এই বইতে শেখানো ভাঁজই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বলতো কেমন ভাবে তৈরী হয়েছে এটা ?

আমি কিন্তু এটা বলে দেবো না। কারণ আমি জানি একটু উৎসাহ আর চেষ্টা থাকলে তোমরা খালি এটাই বলে দিতে পারবে তা নয়, এই রকম আরও অনেক কিছু বানিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। সুকুমার রায়ের সেই কথাটা মনে আছে তো,—

"উৎসাহে কি না হয় ? কি না হয় চেষ্টায় ?
অভ্যাসে চট্‌পট্‌ হাত পাকে শেষটায়।"